ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ১০ সংখ্যা ।। ২৪ কার্তিক, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ১০ নভেম্বর, ২০০৮ ।। Website : www.eswastika.com

বৃহত্তর বাংলাদেশ গড়তেই অসমে বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। পুড়ছে মানুষ, জ্বলছে গাড়ি। আড়ালে দাঁড়িয়ে হায়নার হাসি হেঁসে চলেছে মৃত্যুর সদাগর মুসলিম সন্ত্রাসবাদী ও তাদের পৃষ্ঠপোষক ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা। গত ৩০ অক্টোবর সকালে অসমের রাজধানী গুয়াহাটি, বরপেটা, কোকরাঝাড় এবং বনগাঁইগাঁও-এ ধারাবাহিক বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত মৃত ৭৭ জন এবং আহত পাঁচশোরও বেশি মানুষ। দেশের সব নিরাপত্তা এজেন্সির মতে এমন শক্তিশালী ও সুপরিকল্পিত বিস্ফোরণ এর আগে কখনও হয়নি। গত ২৬ সেপ্টেম্বর ধুবড়ি জেলার বাঁশবাড়িতে যে সাতজন জেহাদি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মারা পড়ে, তারা অসমে বিস্ফোরণের জন্য ব্যাপক পরিমাণে শক্তিশালী বিস্ফোরক বহনের দায়িত্বে ছিল। সেনাবাহিনী এজন্য প্রশাসনকে সতর্ক করেও দিয়েছিল। কিন্তু সরকারি এজেন্সিগুলো তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। লোকসভার বিরোধী দলনেতা লালকৃষ্ণ আদবানি বলেছেন, এই বিস্ফোরণের পেছনে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরাই রয়েছে। অসম-এর কংগ্রেস সরকার হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্টে-র নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। অসম, ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে অনবরত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে। ফলে একের পর এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ দেশ জুড়ে ঘটে চলেছে। কেন্দ্র সরকার 'পোটা' তুলে দিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের কাছে ভুল সংকেত পাঠিয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই পোটা'র

(এরপর ২ পাতায়)

বিস্ফোরণের পিছনে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরাই

গুঢ়পুরুষ ।। অসমে ভয়াবহ ধারাবাহিক বিস্ফোরণের দায় কেন্দ্র এবং এই রাজ্যে ক্ষমতাসীন দুর্বল মেরুদণ্ডহীন কংগ্রেস সরকারকেই নিতে হবে। কারণ, ২০০৫ সালের ১২ জুলাই সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার ও অসম সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল এই কথা বলে যে — অসমে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা যেভাবে সেখানে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে এবং জেহাদি অন্তর্ঘাতের ষড়যন্ত্র শুরু করেছে তাতে সেখানকার জনজীবন বিপন্ন হবে। ভারতের সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট ভাষায় বলেছিল, ''অসম ইজ ফেসিং এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেসন এন্ড ইন্টারন্যাল ডিসটারবেন্স''। অর্থাৎ বন্যার জলস্রোতের মতো বাংলাদেশী মুসলিমরা প্রতিদিন অসমে ঢুকছে। এই বেআইনি অনুপ্রবেশ আদতে বিজেপি বহিরাগতদের আক্রমণ এবং এর ফলে অসমের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে। সুপ্রীম কোর্ট আদেশ দিয়েছিল যে এই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠাতে হবে। কেন্দ্রে মনমোহন সিং-এর সরকার এবং রাজ্যের তরুণ গগৈ-এর সরকার সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেয়। এই অবহেলারই চরম মূল্য দিতে হয়েছে অসমের সাধারণ মানুষকে।

(এরপর ২ পাতায়)

বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত অসমের গুয়াহাটি শহর। গুয়াহাটির গণেশগুড়িতে বিস্ফোরণস্থল পরিদর্শন করছেন বিরোধী নেতা এল কে আদবানি (ডান দিকে)।

বাংলাদেশ ইসলামী ফাউণ্ডেশনের সদস্য সোনামুড়া সীমান্তে আটক

সংবাদদাতা ।। গত ২৯ অক্টোবর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের শ্রীমন্তপুর বিওপি'র জওয়ানরা মোবাইল ফোন ও তিনটি বাংলাদেশী সিম কার্ড সহ এক বাংলাদেশী যুবককে আটক করে এবং সোনামুড়া থানার হাতে তুলে দেয়। ধৃত যুবককে আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত তাকে দশ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে পাঠায়। ত্রিপুরার সোনামুড়া সীমান্ত এলাকায় অবাধে বাংলাদেশী মোবাইল ফোনের ব্যবহার চলছে। তা সত্ত্বেও বিদেশী মোবাইল ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছে না পুলিশ প্রশাসন। বাংলাদেশী মোবাইল সহ অতিরিক্ত তিনটি সিম কার্ড নিয়ে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ধৃত যুবকটি । সে এদেশে বাংলাদেশী মোবাইল ব্যবহারকারীদের কাছে ওই সিমকার্ড বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিল কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সংবাদে প্রকাশ, বি এস এফ-এর কাছে সে তার পরিচয় দেয় আয়ুব খান বলে এবং বলে তার বাড়ি টাকারজলার পাথালিয়াছড়া এলাকায়। কিন্তু তল্লাসীর সময় তার কাছে বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশনের একটি পরিচয়পত্র পেয়ে তাকে সোনামুড়া থানার হাতে তুলে দেয়। থানায় জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার কথায় অসংলগ্নতা ধরা পড়ে। ধারণা করা হচ্ছে সে আন্তর্জাতিক কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্য। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায় তার বাড়ি টাকারজলা থানা এলাকায়। তার পিতা রাজ্য পুলিশে চাকুরি করে। নাম কানু মিঞা। সে ভারতীয় সি আর পি এফ বাহিনীতে চাকুরি করে। কিন্তু তার কাছে কীভাবে বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশনের পরিচয়পত্র এল সে সম্পর্কে তেমন কোনও স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেনি। বর্তমানে তার কাছে কেন বাংলাদেশী দুইটি মোবাইল ফোন রয়েছে এবং তিনটি বাংলাদেশী মোবাইলের সিমকার্ড রয়েছে। তাছাড়া সে কেন অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করেছিল এ সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের সঠিক উত্তর সে দিতে পারেনি।

(এরপর ২ পাতায়)

পুলিশকে পার্টির পেয়াদা বানানোর ফল ভুগছেন বুদ্ধদেব

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। পুলিশ বাহিনীকে গত ৩০ বছর ধরে পার্টির পেয়াদা বানানোর ফল ভুগছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। পার্টির স্বার্থে ক্রমাগত ব্যবহার করে পুলিশকে এতটাই পঙ্গু করে ফেলা হয়েছে যে আজ তাঁরা খোদ কর্তাকেই (পড়ুন মুখ্যমন্ত্রীকে) রক্ষা করতে পারছে না। গত ২ নভেম্বর শালবনীতে জিন্দালদের ইস্পাত কারখানার উদ্বোধন সেরে ফেরার সময় যেভাবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, রামবিলাস পাসোয়ান, জীতিন প্রসাদ এবং সজ্জন জিন্দালের গাড়ির উপর মাইন হামলা হয়েছে এতে প্রমাণিত হয়, মাওবাদীরা এখন চাইলে যা খুশি করতে পারে। যাকে খুশি মারতে পারে। তাদের টার্গেটের বাইরে নন মুখ্যমন্ত্রীও। রাজ্য সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৩০ জন বড় ছোট মাঝারি মাপের সিপিএম নেতা-মন্ত্রী মাওবাদীদের হিটলিস্টে রয়েছেন। অবশ্যই প্রথমের দিকে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নাম। মাওবাদীরা যখন মুখ্যমন্ত্রীকেই আক্রমণ করতে দ্বিধা করছে না তখন বাকি মন্ত্রী-নেতাদের সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভালো। পুলিশ বাহিনীর অনেক শীর্ষ কর্তাই বলেছেন, গত ৩১ বছরে পার্টিকে সার্ভিস দিতে গিয়ে পুলিশের আর নিজস্ব তাকৎ নেই। পুলিশ কেবলমাত্র ঘুষ খাওয়া এক বিচিত্র শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। গত ২ নভেম্বর রাজ্যবাসী দুটি চিত্র দেখেছে — সিঙ্গুর এবং শালবনীতে। সিঙ্গুরে মমতা ব্যানার্জীকে সভায় যেতে বাধা দেয় সিপিএম ক্যাডাররা। সেজন্য আইন নিজের হাতে

(এরপর ২ পাতায়)

শালবনীতে বোমায় বিধ্বস্ত পুলিশের গাড়ি। ইনসেটে আহত নিরাপত্তা রক্ষী।

অসম বিস্ফোরণের ছক কষা হয়েছিল নেপালে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অসমে যে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ হল, তার ছক কষা হয়েছিল নেপালে। প্রাপ্ত সূত্র মোতাবেক কাঠমুন্ডু থেকে ৩০ কিলোমিটার উত্তরে ডুহলিখেল নামে এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১৫-৩০ অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর এক সম্মেলন হয়। আই এস আই-এর উদ্যোগে সংগঠিত এই সম্মেলনে স্থির হয়, জম্মু-কাশ্মীর ও পূর্বোত্তর ভারতে ভবিষ্যতে বোমা বিস্ফোরণের মতো সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের দায়িত্ব থাকবে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন ও তার শাখা সংগঠনগুলির উপর। শুধু তাই নয়, গুজরাট এবং নির্বাচনে ব্যস্ত মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানকে ব্যাপক সন্ত্রাসবাদী হামলার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। সূত্র অনুসারে ওই সম্মেলনে আরও স্থির হয়, দিল্লী, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, হায়দরাবাদের মতো ছয়টি তথ্য-প্রযুক্তির শহরকে দাউদ ইব্রাহিম, হুজি, ডি জি এফ আই, সিমি, এল ই টি, এবং জে ই এম টার্গেট করবে।

ডাইরেক্টর জেনারেল অফ ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স, বাংলাদেশ (ডি জি এফ আই) আহমেদ সুফি পূর্বোত্তর ভারত নিয়ে ওই সম্মেলনে এক বিশদ প্রতিবেদন পেশ করেন। যেখানে অসমকে টার্গেট করার কথা বলা হয়েছিল। (ইতিমধ্যেই তা হয়েছে) দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে কাজকর্ম দেখেন এমন লেফটানেট জেনারেল স্তরের একজন অফিসার আই এস আই-এর পক্ষে ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রথমে পাকিস্তান থেকে দুবাই এবং দুবাই থেকে ঢাকা হয়ে বাংলাদেশ বিমানে কাঠমান্ডুতে পৌঁছান। ভারতীয় গোয়েন্দা এজেন্সীগুলি যাতে কোনও সন্দেহ না করতে পারে তার জন্যই এই রকম ঘুরপথে তার যাওয়া।

ইসলামী ফাউণ্ডেশনের সদস্য সীমান্তে আটক

(১ পাতার পর)

বর্তমানে তার কাছে কেন বাংলাদেশী দুইটি মোবাইল ফোন রয়েছে এবং তিনটি বাংলাদেশী মোবাইলের সিমকার্ড রয়েছে। তাছাড়া সে কেন অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করেছিল এ সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের সঠিক উত্তর সে দিতে পারেনি। উপরোক্ত সবকিছুকে ঢাকা দেবার জন্য সে রাজ্য পুলিশের জনৈক কর্মীকে তার পিতা বলে পরিচয় দেয়। রাজ্য পুলিশের কানু মিঞা নামে যে কর্মীকে ধৃত যুবক তার পিতা বলে পরিচয় দেয় সে আগরতলার পশ্চিম থানায় কর্মরত। সোনামুড়া থানার তলব পেয়ে পুলিশকর্মী কানু মিঞা সোনামুড়া থানায় এসে ধৃত যুবককে সনাক্ত করতে পারলেও সে জানায় ধৃত যুবক তার পুত্র নয়। তার নাম গোলাম কিবরিয়া। তার বাড়ি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ বাড়িয়া এলাকায়। রাজ্য পুলিশ দপ্তরের কর্মী কানু মিঞা আরও জানান, ধৃত যুবক তার দুর সম্পর্কে আত্মীয়, পুজোর সময় তার বাড়ি এসেছিল একদিনের জন্য। তার পুত্রের নাম আয়ুব খান। সে সি আর পি এফ-এ কর্মরত। অর্থাৎ এদেশের আত্মীয়ের পরিচয় দিয়ে সে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস করে। জানা গেছে বাংলাদেশ ইসলামী ফাইন্ডেশনের যে পরিচয়পত্র ধৃত যুবকের কাছে পাওয়া গেছে তাতেও তার নাম গোলাম কিবরিয়া বলে উল্লেখ রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশন সুদূর আরব আমীরশাহীর দুবাই থেকে প্রচুর অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। এবং এই সংগঠনের হাত ধরে বাংলাদেশের মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ, জামায়াতুল মুজাহিদিন নামে সংগঠনের অর্থনৈতিক সাহায্যকারী। এই সংগঠনগুলি বহু বিচ্ছিন্নতাবাদী তথা সন্ত্রাসী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। স্বভাবতই এহেন একটি সংগঠনের পরিচয় পত্রবাহী যুবক কেন একাধিক মোবাইলের সিম কার্ড সহ ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই সিমকার্ডগুলি কি কোনও ভারতীয় সন্ত্রাসবাদী দলের কাছে হস্তান্তরিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে সে আসছিল। যাদের নেটওয়ার্ক চালু রাখার জন্য এই বাংলাদেশী মোবাইলের প্রয়োজন ছিল। মাতাবাড়ি দীপাবলির মেলায় কোনও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করার জন্য কোনও সন্ত্রাসী কর্মীর কাছে তা পৌঁছে দেবার জন্যই নিয়ে এসেছে কিনা তা তদন্ত করছে পুলিশ। কেননা, সোনামুড়া সীমান্তে প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশী নাগরিক প্রবেশ করে। এদের মধ্যে যেমন সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্য রয়েছে। বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র যেমন তাদের হাত হয়ে বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছে, তেমনি বহু কুখ্যাত সন্ত্রাসী এই সীমান্তকে করিডোর করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে চলে যায়।

বৃহত্তর বাংলাদেশ গড়তেই অসমে বিস্ফোরণ

(১ পাতার পর)

থেকেও কড়া আইন রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর চূড়ান্ত ব্যর্থ ও অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে। যখন মৃত ও আহতদের আত্মীয়স্বজনের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে তখন সরকারি (কেন্দ্র ও রাজ্য) পক্ষে চলছে গা-বাঁচানোর পালা। মুসলমান সন্ত্রাসবাদ ও বাংলাদেশ থেকে আগত মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের আড়াল করতে দেশব্যাপী ভয়ানক অপচেষ্টা চলছে। ৩০ অক্টোবরের বিস্ফোরণ বিষয়ে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের আই জি খগেন শর্মার বক্তব্য, গুয়াহাটি বরাবরই সন্ত্রাসবাদীদের মুখ্য টার্গেট — তালিকার শীর্ষে রয়েছে। পুলিশ জেহাদি গোষ্ঠীগুলিকে বিশেষ করে বাংলাদেশভিত্তিক ইসলামি জেহাদি গোষ্ঠী, হরকত-উল-জিহাদ-অল ইসলামি বা 'হুজি'কে সন্দেহ তালিকায় সবার উপরে রেখেছে। তবে শ্রীশর্মা স্থানীয় কোনও গোষ্ঠীর জড়িত থাকার কথা উড়িয়ে দেননি।

গত মাসেই অসমের ধুবড়ি জেলার অসম-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তাবাহিনী সাতজন সন্দেহভাজন জেহাদিকে গুলি করে হত্যা করেছিল। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছিল উন্নত ধরনের সামরিক অস্ত্রশস্ত্রও। শ্রীশর্মার মতে, অসমের ব্যাপক ভয়াবহ বিস্ফোরণের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে জনমনে ত্রাসের সঞ্চার করা। অসম পুলিশের বক্তব্য, বাংলাদেশ থেকে জেহাদিরা ছোট ছোট গোষ্ঠীতে অসমে ঢুকে পড়ছে। তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ টার্গেটই হল গুয়াহাটি।

এদিকে ঘটনার দিন সন্ধ্যায় প্রেস ব্রিফিং-এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-এর বক্তব্য ছিল, সরকারি স্তরে কোনওরকম গোয়েন্দা ব্যর্থতার ঘটনা ঘটেনি। বিস্ফোরণ ঘটতে পারে বলে ধারণা থাকলেও এত বড় ভয়াবহ বিস্ফোরণ-এর কল্পনা ছিল না। শ্রীগগৈ আরও বলেন, সরকারের কাছে খবর ছিল দুর্গাপূজা ও দীপাবলিতে বিস্ফোরণ হতে পারে। তবে গগৈ কোনও গোষ্ঠী বিশেষ-এর জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করেননি। এদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিলও গুয়াহাটি পরিদর্শনে গিয়ে একই ধরনের কথা বলেছেন। তবে আগরতলা (১ অক্টোবর, ০৮) ও অসমে ব্যাপক বিস্ফোরণের পর ত্রিপুরার সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বাংলাদেশের মাটিতে আই এস আই-এর ভারত বিরোধী সন্ত্রাসী কাজকর্ম নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের মতে অসমের বিস্ফোরণ কয়েকটি জেলায় সাম্প্রতিক বোড়ো জনজাতি বনাম বাংলাদেশী মুসলমানদের রক্তাক্ত দাঙ্গার অনুবর্তী ঘটনা হতে পারে। তবে তিনিও উলফা জঙ্গিদের জড়িত থাকার ব্যাপারটা উড়িয়ে দেননি।

অসম প্রশাসন বার বার উলফা'র জড়িত থাকার কথা বললেও উলফার পক্ষে সঞ্জন বড়ঠাকুর এক বিবৃতিতে তাঁর সংগঠনের যুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। এদিকে অসম পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ১৮৭০ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অসম, মেঘালয়, মিজোরাম ও ত্রিপুরার সঙ্গে যুক্ত। সেই এলাকা প্রায় অরক্ষিত। সেখান দিয়ে নিয়মিত আর ডি এক্স সহ অন্যান্য অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র অসম ও দেশের অন্যান্য রাজ্যে প্রতিনিয়ত ঢুকছে।

বিস্ফোরণের পিছনে অনুপ্রবেশকারীরাই

(১ পাতার পর)

অসমের প্রাক্তন রাজ্যপাল লেঃ জেনারেল এস কে সিংহ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা, চরিত্র এবং তাদের কার্যকলাপ নিয়ে এক দীর্ঘ প্রতিবেদন তৈরি করে তখনকার রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণকে দেন। মোট ৪২ পাতার এই প্রতিবেদনে (ইললিগাল ইমিগ্রেসন ইন্টু অসম) রাজ্যপাল হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন যে বাংলাদেশ থেকে পঙ্গপালের মতো মুসলিমরা অনুপ্রবেশ করছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে নিম্ন অসমকে বৃহত্তর বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করা। রাজ্যপাল এস কে সিংহ তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, "The long cherished design of Greater Bangladesh, making in roads into the strategic land link of Assam with rest of India, can lead to severing the entire landmass of the North-East with all its rich resources from the rest of country. This will have disastrous strategic and economic consequences." রাজ্যপালের বক্তব্য ছিল যে নিম্ন অসমের ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার জেলাগুলিকে বৃহত্তর বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা মাফিক এই অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে। বাংলাদেশী মুসলিমরা চাইছে অসমকে পুরোপুরিভাবে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। অসম বিচ্ছিন্ন হলে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। রাজ্যপাল এস কে সিংহ ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণের কাছে জমা দেওয়া প্রতিবেদনে সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে দেখান যে ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, বরপেটা ও হাইলাকান্দি জেলাগুলি কীভাবে মুসলিম প্রধান হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশের জন্মের সময় একমাত্র ধুবড়ি ছাড়া অন্য তিনটি জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৭.৪ শতাংশ। ১৯৯৮-৯৯ সালে গোয়ালপাড়া, বরপেটা ও হাইলাকান্দির মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৭৭.৪২ শতাংশ।

বর্তমানে নিম্ন অসমের ৫৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের জয় নির্ভর করে মুসলিম ভোটদাতাদের অনুগ্রহের উপর। ইতিহাস বলছে যে দেশভাগের সময় নিম্ন অসমের জেলাগুলি পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে জোরদার ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়েছিল। নেহরু ও জিন্না সাহেব দাবি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু নেহরু-জিন্নার সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন অসমের লৌহ মানব গোপিনাথ বড়দুলই। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা ভারতের দয়া ও সৌজন্যে স্বাধীন বাংলাদেশ পাওয়ার পরেও অসম দখলের স্বপ্ন ত্যাগ করেনি। বাংলাদেশের হুজি সন্ত্রাসবাদীরা অসমের অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের মদতে সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী ছায়া যুদ্ধ শুরু করেছে। তারই পরিণতিতে নিম্ন অসমে ১৪টি ধারাবাহিক বিস্ফোরণে এতজন মানুষ প্রাণ হারালেন।

অসমের প্রাক্তন রাজ্যপাল লেঃ জেনারেল এস কে সিংহ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকেও হুঁশিয়ারি দিয়ে ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে বলেছিলেন, অসমের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ঘটেছে অনেক বেশি। ১৯৯৯ সালে তাঁর দেওয়া হিসাবে অসমে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ঘটেছে ১৫ লক্ষ। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে কমপক্ষে ৫০ লক্ষ। এই মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা ঘাঁটি গেড়েছে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মধ্যে চারটি জেলায়। উদ্দেশ্য সেই একই। নিম্ন অসম, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গকে মুসলিম প্রধান করে ভবিষ্যতে বৃহত্তর বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করা। ত্রিপুরার আই জি অব পুলিশ বিষ্ণু দেববর্মা ৩০ অক্টোবর অসমে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর সাংবাদিকদের খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন যে আগরতলায় ১লা অক্টোবরের বিস্ফোরণের ঘটনার পিছনে হুজি-র হাত ছিল। তিনি বলেছেন, ত্রিপুরা, মণিপুর ও অসমের পর এবার "হুজি-বি" (হরকত-উল-জিহাদি-ই-ইসলামি-বাংলাদেশ) আঘাত হানবে উত্তরবঙ্গে। কারণ, বৃহত্তর বাংলাদেশ গড়তে গেলে উত্তরবঙ্গকে তাদের চাই। তিনি গোয়েন্দা সূত্র উল্লেখ করে বলেছেন ইসলামপুর দিয়ে হুজি-র জেহাদিরা বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরণ পাচার করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে এইসব তথ্য দেওয়াও হয়েছে।

অনুপ্রবেশ রুখতে এবং বাংলাদেশীদের চিহ্নিত করে ফেরৎ পাঠাতে কেন্দ্রের প্রাক্তন এন ডি এ সরকার চেষ্টাও করে। কিন্তু তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর তীব্র আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি। ভারতের সংবিধান অনুসারে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায় দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক কবজায় রাখতে জ্যোতি বসু ও তাঁর দল সি পি এম বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ রুখতে বাধা দিয়েছিল। আজও সেই বাঁধা চলছে। এর পরিণাম কী হবে আশা করি তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

ফল ভুগছেন বুদ্ধদেব

(১ পাতার পর)

তুলে নিয়ে তান্ডব চালায় তারা। বিরোধী দল নেতাকেও মারধর করা হয়। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় অজস্র গাড়ি। প্রায় এক হাজার পুলিশ ছিল সেখানে। সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে সিপিএম-এর তাণ্ডবে পরোক্ষে সাহায্য করেছে। অন্যদিকে শালবনীতেও প্রায় দেড় হাজার পুলিশ তিনদিক ঘিরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল মুখ্যমন্ত্রী আসবেন বলে। সেখানে একটি মাছিও গলতে দেওয়া যাবে না — এমন গোছের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, সিঙ্গুরে পার্টির নির্দেশ পালনে অভ্যস্ত পুলিশ যখন শালবনীতে প্রকৃত নিরাপত্তা কায়েমের দায়িত্ব পেয়েছে তখনও নিষ্ক্রিয় থাকার অভ্যাস ছাড়তে পারেনি তারা। মাওবাদীরা মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে ডিরেকশনাল মাইন ফাটিয়ে দিয়েছে। পুলিশ পার্টির পেয়াদা হলে রাজ্যবাসীকে যে নিরাপত্তা দেওয়া যায় না তা এদিন প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রক্তস্নাত অসম

অসম আবার রক্তস্নাত হইল। কমপক্ষে ৭৭ জন নিরীহ নাগরিক এই ধারাবাহিক বিস্ফোরণের শিকার হইয়াছে। আহত হইয়াছে শতাধিক। উগ্রপন্থী বা সন্ত্রাসবাদীরা অসম জুড়ে বারুদের কটু গন্ধ কম ছড়ায়নি, মানুষের তাজা রক্তে হোলি খেলার আয়োজন কম করেনি, কিংবা মানুষের মুণ্ডু লইয়া কম গেণ্ডুয়া খেলেনি, কিন্তু এদিনের ঘটনার বীভৎসতা অতীতের সমস্ত কিছুকেই ছাপাইয়া গিয়াছে। কিন্তু ধবংসের তীব্রতা দিয়া, কিংবা বীভৎসতার পরিমাপ দিয়া বলিতেই হয়, সাম্প্রতিক ঘটনাটি ছিল সবচাইতে বেশি ধবংসাত্মক, সবচাইতে বেশি ভয়াবহ। ইসলামিক সিকিউরিটি ফোর্স (ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন) একটি এস এম এস বার্তা পাঠাইয়া এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করিয়া লইয়াছে। জয়পুর, আমেদাবাদ ও দিল্লীর বিস্ফোরণের সূত্র ধরিয়া ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন এই এস এম এস বার্তায় সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছে — "সমগ্র অসম ও ভারতের অবস্থাও ভবিষ্যতে এইরূপ হইবে।" সেইসঙ্গে এই বিস্ফোরণ ছক অনুযায়ী সফল করিবার জন্য নিজেদের সদস্য ও পৃষ্ঠপোষকদের ধন্যবাদ জানাইয়াছে। তাহাদের এই দাবির পশ্চাতে যদি কোনও সত্য থাকে তাহা হইলে এই সাধারণ কথাটাই স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে, এইসব সন্ত্রাসবাদীরা বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন এবং তাহাদের ঘোষিত 'জেহাদ'-এর সঙ্গে পবিত্রতা বা ঈশ্বরের কোনও সম্পর্ক নাই। প্রেরিত এস এম এস বার্তার শেষ শব্দ "আমেন'-এ তাহাদের এই বিকৃত ভাবনা খুব নগ্ন রূপে প্রকটিত হইয়াছে। তাহাদের এই বিকৃত ভাবনার পরিণাম ভয়ঙ্কর এবং রক্তাক্ত। তাহাদের পথ কখনই ঈশ্বরের অভিমুখে লইয়া যায় না বরং তাহা শয়তানের স্তুতি করে। বস্তুত তাহারা নিজেদের বিশ্বাসের প্রতিই অবিচার করিতেছে। মুসলিম সমাজের যে অংশ মনে করেন এই জেহাদি সন্ত্রাসের সহিত ইসলামের কোনও সম্পর্ক নাই, সন্ত্রাসবাদীদের ভাবনা ও আচরণ তাহাদের ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে।

অসমের এই ভয়ংকর নৃশংস বিস্ফোরণ যাহারা ঘটাইয়াছে তাহাদের পরিচিতি যাহাই হউক না কেন, দুইটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথমত, বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য অসমে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি ভীষণভাবে বিঘ্নিত হইতেছে। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের কারণে অসমে জনসংখ্যার ভারসাম্যে লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্তন ঘটিয়াছে যাহা অত্যন্ত বিপদের। ইতিমধ্যে গুয়াহাটির উচ্চ আদালত এক রায়ে অসমে অনুপ্রবেশকারীদের 'কিং মেকার' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। ১৯৯৯ সালে অসমের প্রাক্তন রাজ্যপাল লে. জেনারেল এস কে সিংহ এ বিষয়ে হুশিয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। সন্ত্রাসবাদীরা তাহাদের বিকৃত ভাবনাকে কাজে পরিণত করিবার জন্য এইসব অনুপ্রবেশকারীদের মধ্য হইতে পছন্দসই লোক খুঁজিয়া পাইতেছে। অর্থাৎ অসম সন্ত্রাসবাদীদের চারণভূমি হইয়া উঠিয়াছে। আর এইজন্য পুরোপুরিভাবে কংগ্রেস-কে দায়ী করা যাইতে পারে। এই দলই নির্লজ্জভাবে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের অসমে বসবাস করিবার জন্য উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, মদত দিয়াছে। নিজেদের পক্ষে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক স্ফীত করিবার উদ্দেশ্যেই অনুপ্রবেশকারীদের এই মদত। সুপ্রীম কোর্ট ত্রুটিপূর্ণ আই এম ডি টি অ্যাক্ট বাতিল করিয়া দিয়াছে এবং অনুপ্রবেশ-কে 'বহিরাগত আক্রমণ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। কিন্তু তরুণ গগৈ-এর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার প্রশাসনিক আদেশ বলে সুপ্রীম কোর্টের রায়কে কার্যত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রিসভাও এই প্রবঞ্চনায় মদত দিয়াছেন। আর এই কারণেই জাতিকে বড় রকমের মাশুল দিতে হইতেছে — দেশের বহু নিরীহ মানুষের প্রাণ গিয়াছে, বহু মানুষ পঙ্গু হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, আই এম ডি টি অ্যাক্টকে কার্যত যতক্ষণ না বাতিল করা যাইতেছে এবং ভারতে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীদের কোমর ভাঙিয়া না দেওয়া হইতেছে, ততক্ষণ এই ধরনের নৃশংস হত্যা কাণ্ডের ঘটনা একের পর এক ঘটিতেই থাকিবে, সাম্প্রদায়িক ও জাতি দাঙ্গায় জাতীয় জীবন বিপর্যস্ত হইতে থাকিবে। সরকার এখনই দৃঢ় হস্তে মোকাবিলা করিতে উদ্যোগী না হইলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিবে। ইতিমধ্যেই অসমে এই অশনি সংকেত লক্ষ্য করা যাইতেছে। সেখানে বোড়ো সমাজ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলিয়া লইয়াছে। অসমের এই বিস্ফোরণ সেই ঘটনার বদলাও হইতে পারে। অর্থাৎ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের যাহারা বিরোধিতা করিবে তাহাদের এই নৃশংসতার মুখোমুখি হইতে হইবে।

এই ঘটনায় যাহারা উদাসীন থাকিবে কিম্বা মানুষের মনোভাব বুঝিতে অক্ষম, তাহারা দেওয়ালের লিখন পড়িতে ব্যর্থ। সমগ্র জাতির মধ্যে যে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার ভাব ক্রমশ চাপিয়া বসিতেছে, তাহা হতাশায় পর্যবসিত হইতে পারে। আর এই হতাশাই প্রবল রোষে পরিবর্তিত হইতে পারে, যাহার পরিণতি ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা স্পষ্টতই ওই সমস্যা সঙ্কুল পরিস্থিতির দিকেই ক্রমশ আগাইয়া যাইতেছি। যত শীঘ্র সরকার ও দেশের জাতীয় দলগুলি ইহা অনুভব করিতে পারিবে, ভবিষ্যত ভারতের পক্ষে তাহা ততই মঙ্গলজনক। সংকীর্ণ নির্বাচনী রাজনীতিতে স্বার্থসিদ্ধি ও জাতীয় স্বার্থ — এই দুইটির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আর এই কাজটি করিতে যত দেরি হইবে ততই আমরা ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের দিকে আগাইতে থাকিব।

প্রাদেশিকতার পাপ

ডঃ প্রীতিমাধব রায়

প্রাদেশিকতা ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক পাপ নয়, আবার একে অতি প্রাচীনকালের পাপও বলা যায় না। প্রাচীন ভারতে বর্ণভেদ ছিল প্রথম যুগে এবং তা ছিল গুণ ও কর্মভিত্তিক। পরে তা বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়, তা নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির পেশাদার নিন্দাকারীরা অনেক নিন্দা করলেও প্রাচীন ভারতে অর্থাৎ হিন্দু যুগের ভারতে প্রাদেশিকতার প্রাবল্য ছিল, এমন কথা শোনা যায় না।

অবশ্য ঠিক এই মুহূর্তে প্রাদেশিকতা ভারতবর্ষে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে, মহারাষ্ট্র বনাম বিহার ও উত্তরপ্রদেশ এর সাম্প্রতিক কুৎসিৎ উদাহরণ। এই যুদ্ধে দুই দিকের নানা নেতা নানা ধরণের বক্তৃতাবাজী করে চলেছেন। বিহারের দুই বিরোধী শক্তি লালু, পাশোয়ান ও নীতিশ কুমার একই সুরে কথা বলেছেন এবং বিজেপি বিরোধী মহা ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি যারা — বজরঙ্গ দল, বিশ্বহিন্দু পরিষদ তো বটেই, এমনকী আর এস এস ও ভারতীয় জনতা পার্টিকেও প্রতিবন্ধের আওতায় আনতে চায়, এবং মহান দেশব্রতী 'সিমি'র উপর থেকে প্রতিবন্ধ তুলে নেওয়ার জন্য জোরালো ওকালতি করছে, তারাও বিজেপি-কে শিবসেনা-র সঙ্গ ছাড়ার জন্য সদুপদেশ দিচ্ছে। কিন্তু বিজেপি তো তাদের মতে এক অস্পৃশ্য দল, তারা কি করবে না করবে, তা নিয়ে তাদের চিন্তার কারণ কী? চিন্তার কারণ অবশ্য এই যে তাদের মিলিত শক্তির চেয়েও ভারতীয় জনতা পার্টি-র শক্তি বেশি। যাক সে কথা। কারণ যে কোনও দেশপ্রেমিক মানুষই চান যে, এই প্রাদেশিকতা দূর করা উচিত। অতএব দেখা যাক, এই প্রাদেশিকতার মূল কোথায় এবং তা কীভাবে দূর হতে পারে।

মানুষ এক সামাজিক জীব। সে এক সমাজের মধ্যে থাকতে, জোট বেঁধে থাকতে ভালবাসে। প্রশ্ন হল, এই জোট বাঁধাটা কেমন হলে তা স্বাভাবিক ও সুন্দর হতে পারে? এটা নির্ভর করে যারা জোট বাঁধতে চাইছে তাদের স্বভাব ও স্বধর্ম কী তার উপর। অস্বাভাবিক ও পরধর্মচালিত কোনও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হলে সেই জোট স্থায়ী হয় না।

স্বামী বিবেকানন্দ বহুদিন আগেই বলেছেন যে — গ্রীস দেশের স্বধর্ম যেমন রাজনীতি, ভারতের স্বার্থে তেমনই ধর্ম। ভারতভূমি ও ভারতীয় জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে ভারতীয় ধর্মের উপর, যাকে বর্তমান কালে হিন্দুধর্ম বলা যায়। যখনই ভারতীয় জনগণের কোনও অংশ এই সনাতন ধর্ম থেকে নিজেদের পৃথক বলে মনে করেছে, তখনই তাদের মধ্যে এসেছে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রবণতা। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ অবশ্যই পাকিস্তানের সৃষ্টি। ভারতের অধিকাংশ মুসলমানেরা যখনই ভারতীয়দের থেকে নিজেদের পৃথক জাতি মনে করলেন, তখনই তাঁরা বিচ্ছিন্নতা চাইলেন। তাঁরা বললেন যে, হিন্দুপ্রধান দেশে তাঁরা স্বাধীনভাবে থাকতে পারবেন না, তাঁদের হিন্দুর অধীন হয়ে থাকতে হবে, তাতে তাঁরা না পাবেন রাজনৈতিক অধিকার, না পাবেন অর্থনৈতিক অধিকার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্ন হয়ে কী লাভ হল?

প্রাদেশিকতার ইন্ধন যোগাচ্ছেন রাজ থ্যাকারে।

পূর্বপাকিস্তান যা এখন বাংলাদেশ, তা হল পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের মধ্যে অন্যতম। জন্মের সময় থেকে অধিকাংশ সময় তাদের কেটেছে স্বৈরাচার শাসনে বা সামরিক শাসনে, যে দেশ আবার দুর্নীতিপরায়ণতার দিক থেকে জগতের মধ্যে অতি উচ্চস্থানে রয়েছে। আর পাকিস্তানও অধিকাংশ সময়ে সামরিক শাসন বা স্বৈরাচারী শাসনের তলায় দিন কাটিয়েছে। তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সেখানে মুদ্রাস্ফীতির হার ২৫ শতাংশ, যারা তার পরম মিত্র সেজেছিল সেই সৌদি আরব, চীন, আমেরিকা তাকে আর্থিক দুরবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য বড়সড় সাহায্য দিতে রাজী নয়। বাধ্য হয়ে সে আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষের দ্বারস্থ হয়েছে। কিন্তু তারা বলেছে, পাকিস্তানকে অর্থসাহায্য পেতে হলে দ্রুত তার সামরিক ব্যয় অন্তত এক তৃতীয়াংশ কমাতে হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পাকিস্তানের সরকারি ব্যয়ের বিরাটতম অংশ ব্যয় হয় সামরিক খাতে, যা তাঁদের সামূহিক জাতীয় আয়ের এক বিরাট অংশ। তাঁদের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে, ভারতের দিক থেকে আগে আক্রান্ত হওয়ার কোনও ভয় তাদের নেই, এবং শান্তি প্রিয় ভারত কোনওদিনই তাদের আক্রমণ করেনি। চীন তাদের মিত্র বলে কথিত। তবুও তারা যে সামরিক ব্যয় কমাতে পারছে না তার কারণ, সেখানে সেনাবাহিনীই কর্তা, তারা সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস করতে দেবে না। যে সন্ত্রাসবাদী গোঁড়া ইসলামীদের তারা ভারতে হত্যা, বিস্ফোরণ, আতঙ্ক সৃষ্টির কাজে লাগাচ্ছে, সেই সন্ত্রাসবাদীরা এখন পাকিস্তান জাঁকিয়ে বসেছে, আর তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচিত সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারছে না মোল্লাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর ভয়ে।

ভারতের বামপন্থী ইতিহাসবিদরা, যারা জওহরলালের আমলে খুবই প্রশ্রয় পেয়েছিলেন, তাঁরা এখনও ধর্মনিরপেক্ষবাদী সরকারের কাছে শ্রদ্ধেয়। এবং তাঁরা তাঁদের সেই বস্তাপচা তত্ত্ব এখনও প্রচার করে যাচ্ছেন যে, ভারতীয় জাতি এক মিশ্র জাতি, আর তাদের সংস্কৃতি হল এক মিশ্র সংস্কৃতি। অথচ, সত্য কথা হল, ভারতের সংস্কৃতি হল মূলত হিন্দু সংস্কৃতি। বহিরাগতরা ভারতে আসার পর দিয়েছে যতটুকু, নিয়েছে তার থেকেও অনেক বেশি এবং এইভাবেই তারা সংস্কৃতির সন্ধান পেয়েছে। যেখানে তারা ভারতের সনাতন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে চায়নি, সেখানেই তারা তালিবানি সংস্কৃতির ধারক হয়ে রয়ে গেছে। যেমন মোগল সম্রাট আকবরের যেটুকু সুনাম আছে তা তার জীবনের পরিণত অবস্থায় অর্জিত।

আকবর তরুণ বয়সে বন্দী হিন্দু সেনাপতি হিমুকে হত্যা করে গাজী হন — বৈরাম খাঁর পরামর্শে। জয়ামল্লও পুত্রকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেন, আবার তার বিদ্বান হিন্দুমন্ত্রীদের সংস্পর্শে এসে অনেকটা উদার হন। উইলিয়ম কেরী ভারতে এসেছিলেন অর্দ্ধসত্য পৌত্তলিক হিন্দুদের খৃস্টধর্মের মাধ্যমে আলোকিত করতে। কিন্তু তিনি যখন ভাল করে সংস্কৃত ভাষায় লেখা হিন্দু শাস্ত্রাদি পড়লেন, তখন তিনি বুঝলেন যে, ওইসব শাস্ত্রাদিতে যে মহত্তম আধ্যাত্মিকতা রয়েছে, তা আর অন্য কোনও ধর্মে নেই।

যে সব ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা বলেছেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতি মিশ্র সংস্কৃতি, তাঁরা রাজনৈতিক মতবাদ, দল প্রভৃতিকে ভারতের একত্বে বন্ধন বলে প্রচার করেছেন। ওই সব মতবাদের প্রচারকেরা বলেছেন যে, ইংরাজ শাসনের আগে নাকি ভারতবর্ষ একটা জাতিই ছিল না। এত বড় মিথ্যা আর হয় না। এই মিথ্যা ধারনার উপর ভিত্তি করে কংগ্রেস স্বাধীনতার আগেই ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের কথা বলেছিল। আসলে দেশ, জাতি ও রাজ্য বা প্রদেশ যে এক নয়, এই ধারণাই তাদের ছিল না। ভুল পাশ্চাত্য ইতিহাসে শিক্ষাই এই ধারনার কারণ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা ক্ষমতাশালী হয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন। এক সময়ে যিনি কনৌজ অধিকার করতে পারতেন, তাঁকেই ভারতের প্রধান সম্রাট বলে মনে করা হত, তাতে সেই সেই অঞ্চলে ধর্ম ও সংস্কৃতির খুব বেশি পরিবর্তন হত না। সম্রাট ধর্মপাল বাঙালী ছিলেন, তাঁর ভাষা ছিল বাংলা। তিনিও এক সময়ে কনৌজ অধিকার করেছিলেন, কিন্তু, তার ফলে কনৌজটা বাংলা প্রদেশ হয়ে যায়নি।

রাজ্যবিস্তার বা ভাষার বিভিন্নতার ভিত্তিতে ভারতকে নানা দেশ বলে বা নানা জাতি বলে মনে করার মতো মূর্খতা আর কী হতে পারে। আচার্য শঙ্কর অখণ্ড ভারতের সমস্ত প্রান্তে হিন্দুধর্মের পুনঃ সংস্থাপন করেছেন। তাঁর মাতৃভাষা ছিল মালয়ালাম। কিন্তু তিনি সমগ্র ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃতে বিচার, প্রচার ও উপদেশ দেন এবং তাতে সফল হন। মহাপ্রভু

(এরপর ৪ পাতায়)

এই সময়

জাল টেলি-গ্রাহক

সন্ত্রাসবাদীদের টেলিফোনে হুমকি দেওয়ার ঘটনা কোনও নতুন নয়। কিন্তু এতকিছুর পরও ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ছেনা। সম্প্রতি টেলিফোন দফতরের অডিটে দেখা গেছে ২০ শতাংশ মতো গ্রাহক কোনও বৈধ পরিচয়পত্র ছড়াই টেলিফোন পরিষেবা ব্যবহার করে চলেছে। ভুয়ো পরিচয়পত্রের মাধ্যমে পরিষেবা পেয়ে গেলেও বিষয়টি এতদিন নজরে আসেনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের। দেশের টেলিফোন ব্যবস্থাতেই যেখানে গোড়ায় গলদ সেখানে সন্ত্রাসীদের হাতে অবৈধ 'সিম' পৌঁছে যাওয়াটা কোনও আশ্চর্যের নয় বলেই মনে করছে আন্তর্জাতিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞরা।

ঘরে অশান্তি

নেদারল্যান্ডের নতুন অভিবাসন মন্ত্রী ফিল ওলাস খোদ সরকারের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। অনাথদের ওপর নিজের সরকারের দুর্ব্যবহারে মন্ত্রী অত্যন্ত রুষ্ট। তাঁর বক্তব্য সরকার অনাথদের সমস্যা দূর করতে মোটেও সচেষ্ট নয়। খোদ মন্ত্রীর এই বিদ্রোহে নড়েচড়ে বসেছে সরকার। তবে নেদারল্যান্ড সরকারের এই মনোভাবে সেদেশের অনেকেই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ।

চুরি বিদ্যা

একেবারে উন্নত দেশে উন্নত বুদ্ধির চুরি। নেটের মাধ্যমে খোদ প্রেসিডেন্টের অ্যাকাউন্ট থেকেই টাকা চুরি হয়ে গেল। ফরাসি প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজির ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে সম্প্রতি বেশ কিছু টাকা (ইউরো) খোয়া গেছে। খোদ ফরাসি দেশের বুকে তাও প্রেসিডেন্টের টাকা চুরিতে রীতিমতো অবাক অনেকেই।

ক্ষুধা

সভ্যতার এত উন্নতির পরও আজ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ অন্নের অভাবে দিন কাটাচ্ছে। মানুষের জীবন ধারনের প্রধান রসদের অভাব বিশ্বের কাছে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ক্ষুধা আর দারিদ্র্য নিয়ে বিশেষজ্ঞরা গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে বিশ্বে ৯৭ কোটি মানুষ খাদ্যের অভাবে দিন কাটাচ্ছে বলেও জানা গেছে। জাতিসঙ্ঘের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ৫ বছরের কম বয়সী অপুষ্টিতে ভুগছে প্রায় দশ লাখ শিশু। বিশ্বের যে কোনও দেশের পক্ষে এই ঘটনা উদ্বেগের কারণ।

স্তব্ধ বিচার

এই মুহূর্তে দেশের হাইকোর্টগুলিতে আটত্রিশ লক্ষেরও বেশি মামলা ঝুলে রয়েছে। এমনকী সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টেও ঝুলে রয়েছে আটচল্লিশ হাজার মামলা। বিচার ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বিবৃতি দিতে গিয়ে এমনই তথ্য লোকসভায় পেশ করেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এইচ আর ভরদ্বাজ। তিনি আরও জানান, এই বিশাল পরিমাণ মামলার নিস্পত্তি করতে যোগ্য বিচারক এবং উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরির ব্যবস্থা চলছে। যদিও দেশের হাইকোর্টগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ বিচারকের পদ আড়াইশোরও বেশি ফাঁকা রয়েছে।

কোণঠাসা পাকিস্তান

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির উপর বিন্দুমাত্র ভরসা রাখতে রাজি নয় রাষ্ট্রসঙ্ঘ। এক বিবৃতিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব বান কি মুন জানান, জরুরীকালীন ভিত্তিতে ইসলামাবাদে কর্মরত রাষ্ট্র সঙ্ঘের কর্মীদের ইসলামাবাদ পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্রমবর্ধমান জঙ্গি কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সে দেশের সরকার ব্যর্থ হওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত নিতে হল বলে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মত। একইভাবে ইউরোপের দেশগুলিও পাকিস্তানের সঙ্গে আকাশপথের সম্পর্ক বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিও একই পথে হাঁটতে চলেছে বলে সংবাদ সূত্রে জানা যায়।

মাওবাদীরা হামলার এলাকা বিস্তার করছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত ২ নভেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনীতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কনভয়ে হামলা আবারও একবার সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে মাওবাদীরা তাদের হামলার এলাকা ক্রমেই বাড়াচ্ছে। গত কয়েক বছরে তাদের হামলার খতিয়ানটা দেখলেই তা স্পষ্ট হবে।

শালবনী বিস্ফোরণের পর পুলিশ কর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন।

গত ২৭ জুন ০৭, পুরুলিয়া-ঝাড়খণ্ড বর্ডারের বিরামডি স্টেশন জ্বালিয়ে দেয় ৫০ জন মাওবাদী সমর্থক।

১৬ নভেম্বর ০৭, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভুলেভেদার পঞ্চায়েত অফিস বোম দিয়ে উড়িয়ে দেয় তারা। এরই ঠিক তিনদিন পর ১৯ নভেম্বর বীরভূমের সাঁইথিয়া অন্ডাল রেল লাইনে বোম বিস্ফোরণ ঘটায় তারা।

২১ ফেব্রুয়ারি ০৮, পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলপাহাড়িতে স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক তথা সিপিএম নেতা করমচাঁদ সিংকে তাঁরই ক্লাসরুমে গুলি করে হত্যা করে মাওবাদীরা।

১১ মে ০৮, পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে বিএসএফ-র গাড়িকে উড়িয়ে দেয় মাওবাদীরা। ঘটনায় ২ জন জওয়ান নিহত ও ৭ জন আহত হন।

২২ অক্টোবর ০৮, মাওবাদীদের বিস্ফোরণে বেলপাহাড়িতে এক ডাক্তার নার্স সহ গাড়ির চালক প্রাণ হারায়।

এদিকে মাওবাদী নেতা বা রাজ্য সম্পাদককে গ্রেপ্তার করায় তারা আরও বড় ধরনের হামলা করতে পারে বলে পুলিশের ধারনা। গোয়েন্দাদের মতে রাজনৈতিক ফলাফলের ক্ষেত্রেও মাওবাদীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আসন্ন লোকসভার মুখে তাদের টার্গেট দক্ষিণবঙ্গ। ধৃত মাওবাদী রাজ্য সম্পাদক পুলিশের কাছে স্বীকারও করেছে যে তারা মালদা, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মতো জেলাগুলিতে জনভিত্তি প্রসারিত করছে।

এবার আমেরিকার হামলা পাকিস্তানেও

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আমেরিকাতে সি আই এ এবং আই এস আই বৈঠক হতে চলেছে। এজন্য আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ সুজাপাশা। তিনি আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ-র ডিরেক্টর মিঘায়েল ভি হেডনের সঙ্গে বৈঠক করবেন। সাত বছরের বেশি সময় ধরে আমেরিকা ও পাকিস্তান একত্রে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে। ২০০৮-এ দেখা যাচ্ছে, আফগানিস্তানে অবস্থানরত আমেরিকান সেনাবাহিনীকে সঙ্গী পাকিস্তানের মাটিতেই আক্রমণ চালাতে হচ্ছে। এবছর আমেরিকান আক্রমণে এখনও পর্যন্ত ৩০০ পাকিস্তানীর মৃত্যু হয়েছে।

অসমের পর কী শিলিগুড়ি ?

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অসমের পর এবার বাংলাদেশী সন্ত্রাসবাদীরা উত্তরবঙ্গে হামলা করতে পারে বলে মনে করছে গোয়েন্দা এজেন্সীগুলি। বিশেষত শিলিগুড়ির মতো কর্মচঞ্চল শহরই তাদের প্রধান টার্গেট হতে পারে। অসম বিস্ফোরণে সন্ত্রাসবাদীরা যেমন স্থানীয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ছিল, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও সে সম্ভবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছে না গোয়েন্দারা। গোয়েন্দাদের মতে এক্ষেত্রে তারা কামতাপুরীর পাশাপাশি ভুটানি নেপালিদেরও কাজে লাগাতে পারে। তাছাড়া উত্তরবঙ্গ জুড়ে বাংলাদেশীদের সংখ্যাধিক্য এই সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে দেয়। সুরক্ষা দফতরের অফিসারদের মতে উত্তরবঙ্গ হচ্ছে চারটি দেশ ও চারটি রাজ্যের কাছাকাছি। তাই নিরাপত্তার সমস্যাটা আরও কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে গোর্খা সমর্থকদের বিক্ষুব্ধ তথা সরকার বিরোধী মনোভাবের ফায়দাও সন্ত্রাসবাদীরা তুলতে পারে।

প্রাদেশিকতার পাপ

(১ পাতার পর)

শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধেও এমন কথা বলা যায়। কাজেই ভারতের বন্ধন ও একত্ব ভাষাগত পার্থক্য বা প্রদেশের ভিত্তিতে বিভিন্ন বলে চিন্তা করাটাই ভুল। মোটামুটিভাবে ভারতে ১৪৪টা ভাষা-ভাষী গোষ্ঠী আছেন, তাহলে কি আমরা দেশটাকে ১৪৪ ভাগে ভাগ করব। আবার সব ধরনের হিন্দীকে যদি একটা ভাষা ধরা যায় তা হলে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ এবং বিদর্ভ অঞ্চল নিয়ে একটা প্রদেশ বা রাজ্য গড়তে হয়। আবার উপভাষা ধরলে বর্তমানের খন্ডিত বিহারের তিন বা ততোধিক রাজ্য গড়তে হয়। কারণ, সেখানে বিশুদ্ধ হিন্দী, ভোজপুরী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষা আছে।

আসলে রাজ্য গড়া হয়ে থাকে শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য। এইদিক থেকে দেখলে প্রদেশ বা রাজ্যের হাতে বেশি ক্ষমতা না রেখে গ্রাম, উপজেলা ও জেলার হাতেই বেশি ক্ষমতা রাখা উচিত। গান্ধিজী তাঁর লেখা 'হিন্দ স্বরাজ'-এ এমন কথাই লিখেছেন।

ভারতের একত্বের একটাই বন্ধন হতে পারে তা হল ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতি। ভারত এক হল হিন্দুত্বের ভিত্তিতে, এই ভিত্তিকে গ্রহণ করলে ভারতের অন্তত শতকরা ৮২ জন অধিবাসী নিজেদের এক দেশ বলে মনে করবেন। আর বাকী ১৮ জন তাঁদের ধর্মকে স্বাধীন উপাসনা পদ্ধতি মনে করে সেইভাবে চলতে পারেন, কিন্তু অবশ্যই ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে, অনুপ্রবেশ করে ভারতকে অহিন্দু দেশে পরিণত করব, এই মনোভাব ত্যাগ করে। একথা সত্য যে যখন অসমীয়া জনসাধারণের একাংশ নির্বোধের মতো 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন করেছিলেন, এবং প্রধানতঃ বঙ্গভাষাভাষী হিন্দুদের বিতাড়ন করেছিলেন, তখন পাকিস্তানের অনুপ্রবেশকারী মুসলমানেরা নিজেদের অসমীয়া বলে অসমে জোরালো ঘাঁটি গেড়েছিল এবং ক্রমশ মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছিল। যার ফলে অসম মুসলমান প্রদেশ হতে চলেছে।

ছয়টি জেলার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা মুসলমান সংখ্যা হল ১। ধুবড়ী (৭৪.৩), ২। বরপেটা (৫৯.৩), ৩। হাইলাকান্দি (৫৭.৬), ৪। গোয়ালপাড়া (৫৩.৭), ৫। করিমগঞ্জ (৫২.৩), ৬। নওগাঁও (৫১)। সেখানে ৫০ বৎসরে মুসলমান হার বৃদ্ধি পেয়েছে ২৯.৩ শতাংশ হারে। যার ফল সাম্প্রতিকতম ভয়াবহ বিস্ফোরণ। তবে এই বিস্ফোরণ কেবল ভাসমান বরফের চূড়াটুকু মাত্র। উলফা যদি অসমকে বিচ্ছিন্ন করে এবং কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী যদি আপাত ভোট লাভের জন্য অনুপ্রবেশ বন্ধ করার চেষ্টা না করে তাহলে অসম উলফাদের হাতেও থাকবে না,কংগ্রেসের হাতেও থাকবে না, এটি যাবে মুসলমানদের হাতে।

ভারতকে খন্ডিত হওয়া থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হল এইবোধ যে, ভারতে কতকগুলি ভাষাভাষীর সমষ্টি নয়, রাজ্য কোনও পৃথক সত্ত্বা নয়, মিশ্র সংস্কৃতির ভিত্তিতে ভারত হয় না। ভারতের একাত্মতার ভিত্তি হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি। এই বোধ ও তদনুযায়ী চেষ্টাই প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাকে রোধ করতে পারে।

আমাদের মনে আছে যে, ঘোর বঙ্গাল খেদা আন্দোলনের সময়েও সঙ্ঘের বঙ্গভাষা-ভাষী স্বয়ংসেবক ও অসমীয়াভাষী স্বয়ংসেবকদের মধ্যে মিত্রতা একটুও কমেনি। মহারাষ্ট্রী বালকৃষ্ণ নায়েক, বাংলার স্বয়ংসেবকের কাছে অতিপ্রিয় কেষ্টদা, ভাষার তফাৎ কোনদিন আমাদের মনের তফাৎ করেনি। কারণ — আমরা সবাই হিন্দু।

রাজ্য রাজনীতি

প্রতিটা জোনাল ও লোকাল কমিটি দ্বিধা বিভক্ত

১ ঃ ১ প্রার্থী দিয়ে সি পি এমকে হারানোর এটাই সুযোগ

নিশাকর সোম

পশ্চি মবঙ্গের মন্ত্রিসভায় কয়েকজন আছেন, যাঁরা নিজেদের খুশিমতো বলেন এবং করেন। এঁদের উপর পার্টির অনুশাসন কিছু নেই। বরঞ্চ অনর্গল পার্টি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলার পর — সেই নেতার "শ্রীকৃষ্ণ"-এর চাপে তাঁর প্রমোশন হয়। অথচ কোনও এক অজ্ঞাত কারণে কলকাতার এক নেতাকে (অলোক মজুমদার) মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ বাবুর চাপে বহিষ্কার করা হয়েছিল। "শ্রীকৃষ্ণ" এর ভক্ত সেই নেতা সিঙ্গুর থেকে টাটারা চলে যাওয়ার পরই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, সিঙ্গুরের টাটাদের জায়গাতেই আর একটি মোটর কারখানা হবে এবং ৩১ অক্টোবর-এর মধ্যে "মউ" স্বাক্ষর হবে। রাজ্যের শিল্পসচিব ডঃ সব্যসাচী সেন বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছেন। এই মন্ত্রী নেতা সিপিএম-কে তথা মুখ্যমন্ত্রীকে বিপদে ফেললেন। কারণ তিনি বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী যথা সময়ে ঘোষণা করবেন। এই নেতা মন্ত্রীকে সংযত করার ক্ষমতা সিপিএম-এর রাজ্য নেতৃত্বের নেই। এর ফলেই নীচের তলায় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। আগামী দিনে বহু পার্টি কর্মী দরদী সিপিএম-এর বিরুদ্ধে ভোট দেবেন। তাই যদি প্রতিটি কেন্দ্রে ১ ঃ ১ হয় তবে সিপিএম শেষ হয়ে যাবে। শোনা যাচ্ছে মমতা দেবীকে জনৈক সিপিএম মন্ত্রী, জনৈক আর এস পি মন্ত্রী এবং সিপিআই-এর জনৈক প্রাচীন মন্ত্রী একত্রে নাকি মদত দিয়েছিলেন!

লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু রাজ্যের সমস্ত জেলাতে যাচ্ছেন। এদিকে কলকাতার দুটি কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে যথেষ্ট চিন্তায় পড়েছেন সিপিএম রাজ্য নেতৃত্ব। কলকাতা জেলা উত্তর কেন্দ্রে সুধাংশু শীল-কেই প্রার্থী চায়। দক্ষিণে মহঃ সেলিম-এর নাম আলোচনায় উঠেছে। কোনও কোনও নেতা মমতার বিরুদ্ধে সুভাষ চক্রবর্তীকে দাঁড় করানোর কথা বলছেন।

সুভাষ চক্রবর্তীকে পার্টি পিডিএস ভাঙার কাজ দিয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন পিডিএস গঠনের প্রধান পরিকল্পনা সুভাষ চক্রবর্তীর। স্রষ্টাকে ধ্বংস করার দায়িত্ব দেওয়া হল?

সুভাষ চক্রবর্তীকে পার্টি পিডিএস ভাঙার কাজ দিয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন পিডিএস গঠনের প্রধান পরিকল্পনা সুভাষ চক্রবর্তীর। স্রষ্টাকে ধবংস করার দায়িত্ব দেওয়া হল? সুভাষবাবু শাঁখের করাতে পড়েছেন। এবার তাঁকে টাইট করবার জন্য মদন ঘোষ তৈরি। মদন ঘোষই আগামী রাজ্য পার্টির সম্পাদক হবেন। এইসব বিষয় নিয়ে মেদিনীপুরের দু'টি জেলা কমিটি, ২৪ পরগনায় দু'টি জেলা কমিটি এবং কলকাতা জেলা কমিটি সরব। রাজ্যের প্রতিটি জোনাল কমিটি এবং লোকাল কমিটি সমান্তরালভাবে দ্বিধা বিভক্ত, ১ঃ১ প্রার্থী করে সিপিএম-কে হারানোর এই তো মহেন্দ্রক্ষণ।

সমগ্র রাজ্যে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া এবং চিকেনগুনিয়া-এর আক্রমণে প্রায় শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে বেসরকারি মত। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর পূর্বাহ্নে কোনও প্রতিরোধী ব্যবস্থা নেয়নি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ব্যর্থ।

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও জঞ্জাল সাফাই এবং মশক দমনে ব্যর্থ। কারণটা হল মেয়র একটি অকেজো নিস্ক্রিয় পার্টটাইমার। কলকাতা পুরসভার কি হচ্ছে তা তিনি জানেন কি? জানেন না, পৌর সার্ভিস কমিশনের দুটি পরীক্ষায় হাজার হাজার প্রার্থীর কাছ থেকে টাকা নেওয়া হল। একটির সমস্ত টাকা মেরে দেওয়া হল, কোনও পরীক্ষা হল না। অপরটির হাজার হাজার আবেদনকারীর মধ্যে কয়েকশতের পরীক্ষা হয়েছে, ইতিমধ্যে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সিভিল পুলিশ নিয়োগ করে কলকাতার রাজপথে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণে তাদের লাগিয়েছে। এর ফলে ধীরে ধীরে পুরসভা কী কলকাতার আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব নেবার দাবি করবে।

বামফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং কলকাতার মেয়রকে বদল করার দাবি এসে যাচ্ছে। সিপিএম-এর কলকাতা জেলা কমিটিও মেয়রকে পরিবর্তন করার পক্ষপাতী। তারা এই পদে আশীষ দে-কে বসাতে চায়। কিন্তু বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বুদ্ধ বাবুর অতিপ্রিয়। কাজেই কিছুই হবে না। এদিকে রাজ্যের সমগ্র পার্টির মধ্যে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর-এর ঘটনাতে মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এক তীব্র অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। নিচের তলায় বেশি সংখ্যক কর্মী মুখ্যমন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রীর অপসারণের কথা বলে চলেছে। কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে বুদ্ধ - নিরুপম হঠাও, পার্টি বাঁচাও।

ভাইয়াজী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। জীবনের ৭৬ টা বছর নিজের কাজটাকেই ভালোবেসে গেছেন তিনি। আজও কাজের প্রতি ভালোবাসা তাঁর এতটুকুও কমেনি। যদিও বার্ধক্যের দোড়গড়ায় এসে কাজটাকে বিদায় দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না তাঁর। কিন্তু তাতে কী? সম্পর্কটাকে তো শেষ করা যায় না। তাই আজও সময় পেলে মামচাঁদ দিল্লীর গল্ফ ক্লাবটা-য় ঘুরতে আসেন। একদিন কাকার হাত ধরেই গল্ফ খেলার সরঞ্জামবাহক হিসাবে এখানে এসেছিলেন। বয়স তখন খুব কম। একটু বড় হবার পর — যখন বয়স ১৩, তখনই প্রথম চার আনা উপার্জন। সেই থেকে শুরু। পয়সা কড়ি এই পেশায় তেমন খুব একটা নেই। তবুও জীবনের দুঃখ কষ্টকে ভুলে কাজটাকেই ভালোবেসেছেন মামচাঁদ। কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়া যেন তাঁর ঠিকুজীতে লেখেননি ভগবান। জীবনের সব ব্যথা-বেদনার মাঝেও মামচাঁদের বিশ্বাস — জীবনে সবকিছু মানিয়ে চলাটাই প্রকৃত জীবন। এ পেশায় রোজগার কম — দিনে ৭০ টাকা। খুব বেশি হলে ১৩০। সে নিজেও চায় না তাঁর নিজের ছেলে বা নাতি এই পেশায় আসুক। কারণ, এই পেশায় সংসার চালানোটা একটু নয়, অনেকটাই কঠিন। তবুও মামচাঁদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও ব্যবহারই তাঁকে সকলের কাছে ভাইয়াজীতে পরিণত করেছে। ঝা চক চকে রাজপ্রাসাদ থেকে বস্তির মানুষের কাছে মামচাঁদ ভাইয়াজী হিসাবেই বিশেষ পরিচিত। ভাইয়াজী যেন মাটির তৈরি মানুষ। মনের জোরে বহুগুণ এগিয়ে থাকলেও শরীর যেন আর কিছুতেই সাথ দিচ্ছিল না। ৯৭-এর সেই হার্ট অ্যাটাকটা ভাইয়াজীর শরীরটাকে অনেকটা কাবু করে দেয়। আর্থিক সামর্থ্য ছিল না চিকিৎসা চালাবার। কিন্তু তাতে কী? ভগবান বলে তো একটা কিছু আছে। কথায় বলে নর রূপে নারায়ণ। আর যেখানে মানুষটাই দেবতুল্য সেখানে সাহায্যটা ......। একেবারে নররূপে নারায়ণী হিসাবেই সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন মোনা কৃপালনী। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজও ভাইয়াজীর জন্য অর্থ ব্যয় করে চলেছেন। তবে একে কিছুতেই তিনি সাহায্য বা দান বলতে রাজি নন। কৃপালনীর কথায় এতো সেবকের সেবা নয়। দেবতুল্য মানুষের জন্য কিছু করার মতো পুণ্যকাজ আর কী হতে পারে। শুধু কৃপালনীই নয়, এই পুণ্যকাজে রূপা গুপ্তাও অংশীদার হয়েছেন — কর্তব্যের জন্য সমর্পিত মানুষের সেবায়। তিনি আজ অনেকটা সুস্থ। কৃপালনী ও রূপা গুপ্তার সহায়তা আজও ভাইয়াজীর সঙ্গে রয়েছে। ভাইয়াজী আজ আর এই পেশায় নেই। ক্লাবের প্রতি কোনও ক্ষোভও নেই। ভাইয়াজী যেন মাটির প্রদীপ। যিনি নিজেকে জ্বালিয়ে অপরকে আলো দিয়েছেন। দারিদ্র্যের মাঝেও তিনি মহান।

ভাইয়াজী ও মোনা কৃপালনী

উত্তর দিনাজপুরে রক্তের অভাবে হাসপাতালগুলি ধুঁকছে

মহাবীর প্রসাদ টোডী ।। উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের জোগানে টান পড়ায় চরম বিপাকে পড়েছেন রোগী ও তাদের পরিজনবর্গ। রক্তের অভাবে হাসপাতালগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন স্থগিত রাখতে হচ্ছে।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এই সমস্যার কথা স্বীকার করেছে। পুজোর সময় রক্তদান শিবির না হওয়াতেই নাকি এ সঙ্কট দেখা দিয়েছে বলে তারা জানিয়েছে।

জেলার রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্ক রয়েছে। কিন্তু রায়গঞ্জ হাসপাতালে পজিটিভ গ্রুপের রক্ত নেই। রায়গঞ্জ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে যে, হাসপাতালে প্রয়োজনীয় রক্তের জোগান না থাকায় অনেক অপারেশন করা যাচ্ছে না। ফলে রোগীদের চিকিৎসার সমস্যা হচ্ছে। প্রতিদিন কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ ও ইটাহার সহ করণদীঘি থেকে প্রচুর রোগী রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে আসে। তাঁদের নিয়েই বেশী সমস্যা হচ্ছে। কারণ অনেক দূর থেকে হাসপাতালে এসে তাঁদের ফিরে যেতে হচ্ছে। আর ইসলামপুর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কেও একই অবস্থা। এখানে রক্তের সঙ্কট আরও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, প্রায় সারা বছরই উপরোক্ত হাসপাতালে কোনও না কোনও সমস্যা থাকেই। কিন্তু সব সময় এসব সমস্যার কথা গোচরে আসে না। আর যখন গোচরে আসে তখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নানা অজুহাতে এসব খন্ডন করে নিজের দায়বদ্ধ তার ব্যাপারে গা-ঝাড়া দেওয়ার চেষ্টা করেন।

অসমে বিজেপি-অগপ আসন সমঝোতা চূড়ান্ত

সংবাদদাতা ।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে অসমে প্রধান বিরোধী দল অগপ এবং অন্যতম বিরোধী দল বিজেপি আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করে নিয়েছে। তথাপি অগপ আপাতত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটে সামিল হচ্ছে না। কলকাতায় অগপ সভাপতি চন্দ্রমোহন পাটোয়ারীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিরা বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ এবং যশবন্ত সিনহার সঙ্গে বৈঠকে আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করেন। চুক্তি অনুযায়ী অসমের চৌদ্দটি লোকসভা আসনের মধ্যে অগপ এবং বিজেপি ছয়টি করে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। বাকী দুটি আসনের মধ্যে একটি করে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বোকো এবং কার্বি আঞ্চলিক দল। গুয়াহাটি ও মঙ্গলদৈ আসন দুটিতে যে কোনও একটি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

রমেন ডেকা

সুষমা স্বরাজ

এই আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন অগপ বিধায়ক পদ্ম হাজারিকা। বরপেটা, তেজপুর, লখিমপুর, ডিব্রুগড়, কলিয়াবর সহ গুয়াহাটি বা মঙ্গলদৈ-এর মধ্যে যে কোনও একটি বেছে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে অগপ। গুয়াহাটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবল ইচ্ছার কথা বিজেপি জানিয়েছে অগপ-কে। দলের জাতীয় সহসভানেত্রী বিজয়া চক্রবর্তীকে এই আসনে প্রার্থী করতে চায় বিজেপি। রাজ্য সভাপতি রমেন ডেকা বলেছেন, গুয়াহাটি আসনে বিজেপি না অগপ প্রার্থী দেবে, তা স্থির করা যায়নি।

বর্তমান লোকসভায় অসমের মোট চৌদ্দটি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৯, বিজেপি ২ এবং অগপ'র ২টি আসন রয়েছে। অগপ এবং বিজেপি-র মধ্যে এই আসন সমঝোতা শাসক দল কংগ্রেসকে খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। পক্ষকাল আগে অগপ দল বৃন্দাবন গোস্বামীকে সভাপতি পদ থেকে অপসারণ করে চন্দ্র মোহন পাটোয়ারীকে সভাপতি নির্বাচন করার পর দ্রুত অগপ-বিজেপি আসন সমঝোতার দিকে এগোয়।

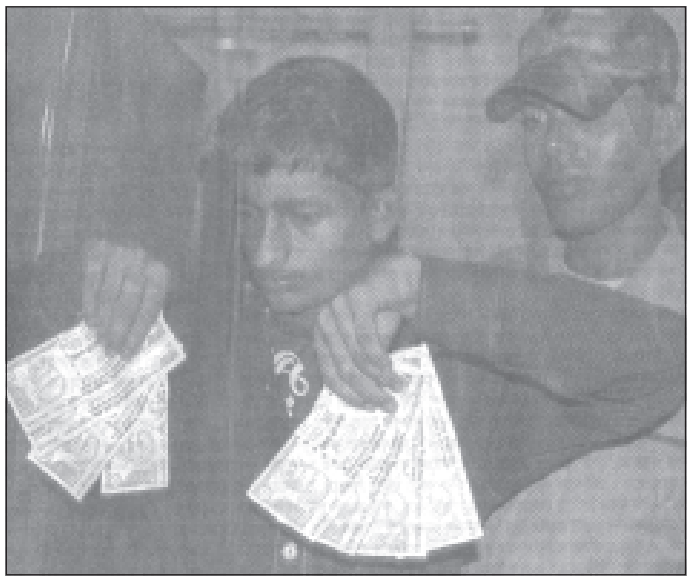

জাল নোট সহ পুলিশ হেফাজতে ধৃত পাচারকারী।

পুলিশের জালে জাল নোট

সংবাদদাতা ।। বাংলাদেশ থেকে অনবরত জালনোট বিভিন্ন এজেন্ট মারফৎ পাচার হচ্ছে লাগোয়া রাজ্য ত্রিপুরা, অসম, এবং পশ্চিমবঙ্গে। তারপরই এগুলি চলে যাচ্ছে সারা ভারতে। দীর্ঘদিন জালনোটের বাহক হিসেবে কাজ করে আসছে সীমান্তে বসবাসকারী মুসলমানরা। কিন্তু এবার বাজারে জালনোট ছড়িয়ে দিতে ব্যবহার করা হচ্ছে হিন্দুদেরও। ফলে অপুট এইসব হিন্দুরা পুলিশের জালে ধরা পড়ছে। আসল কুশীলবরা কিন্তু থেকে যাচ্ছে পর্দার আড়ালে।

সম্প্রতি জাল নোটসহ এক যুবক পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। ধৃত যুবকের নাম লিটন দেবনাথ (২২), বাড়ি পশ্চিম থানার রামনগর বর্ডার গোলচক্করে। রামনগর চার নং রোড এলাকা থেকে পশ্চিম থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত যুবকের কাছ থেকে পুলিশ আটটি পাঁচশ টাকার জাল নোট পেয়েছে।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে পুলিশ জানায়, জাল নোট নিয়ে পশ্চিম থানাধীন রামনগর বর্ডার গোলচক্কর এলাকার লিটন দেবনাথ রামনগর রোড নং-চার হয়ে রাজধানী শহরে ঢুকছে— এই খবর স্থানীয় পুলিশ আগে থেকেই পেয়ে যায়। সেই মতো পশ্চিম থানার দুই পুলিশ অফিসার কৃষ্ণকান্ত বোস ও রাজকুমার জমাতিয়া দুপুর দেড়টা নাগাদ রামনগর চার নং রোডে ওঁৎ পেতে বসে থেকে জাল নোটসহ লিটন দেবনাথকে গ্রেপ্তার করেন।

কোথা থেকে তার কাছে এতগুলি জাল নোট এল এবং সে কতদিন এই কাজে যুক্ত রয়েছে এটাই এখন বড় প্রশ্ন। জাল নোট পাচার চক্রের সন্ধানে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

সন্ত্রাস রোধে সেনাবাহিনীকে জমি হস্তান্তর

সংবাদদাতা।। অরুণাচল সরকার সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ রোধে রাজ্যের তিনটি জেলা চেসা, চেগমারা এবং হোলংগি-র প্রায় আটশ একর জমি সেনাবাহিনীকে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেনাবাহিনী এই জমিতে শিবির গড়ে তুলবে। যার ফলে উক্ত এলাকার জনগণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে। এই এলাকাগুলি সন্ত্রাসবাদীদের অবাধ বিচরণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। রাজধানী সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে অপহরণ করে সন্ত্রাসবাদীরা এখানে আশ্রয় নেয়। সন্ত্রাসবাদীদের অপরাধমূলক কাজকর্ম রুখতেই এখানে সেনা শিবির গড়ে তোলার জন্য সরকার সেনাবাহিনীকে আটশ একর জমি দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গেগং আপাং-এর পুত্র গেটেম আপাং ও তাঁর সঙ্গীত শিক্ষককে জঙ্গিরা অপহরণ করে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল।

যদিও অপহৃত মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে দেয় অপহরণকারীরা। অনেক সময় আলফা জঙ্গিরা অপহৃত ব্যক্তিদের এখানে এনে আশ্রয় নেয়। সম্প্রতি অরুণাচলে হত্যা, অপহরণ এবং পাচার বাণিজ্য সহ বিভিন্ন সমাজবিরোধী ও সন্ত্রাসমূলক কার্যকর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার এই ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্ম প্রতিরোধে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে।

রাজ্যপালকে কর্ণেল উপাধি

সংবাদদাতা ঃ অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল তথা অবসরপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ জেনারেল যোগিন্দার যশবন্ত সিং-কে মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট-এর সাম্মানিক কর্ণেল উপাধিতে ভূষিত করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। এই বিরল সম্মান তাঁকে দেওয়া হয়েছে দীর্ঘ ৪৩ বছর এই রেজিমেন্টকে সামরিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য। একই রেজিমেন্টকে এত বছর পরিষেবার একটি রেকর্ড তৈরী করেছেন জেনারেল সিং।

গত ২২ অক্টোবর বেলগাঁওয়ে রেজিমেন্ট-এর কেন্দ্রে এক পার্চমেন্ট সিরিমনির মাধ্যমে জেনারেল সিংকে জীবনব্যাপী অবদানের জন্য সাম্মানিক কর্ণেল উপাধিতে ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিমান বাহিনীর অধ্যক্ষ এয়ার মার্শাল টি এস রনধাওয়া। আবেগ- মথিত রাজ্যপাল তথা অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল শ্রীসিং বলেন, তাঁর এই উপাধির জন্য আসল কৃতিত্ব সাহসী দেশপ্রেমিক মারাঠা সৈন্যদের। ১৯৬৭ সালে ২১ বছর বয়সী ক্যাপ্টেন, অরুণাচল প্রদেশের বর্তমান রাজ্যপাল শ্রীসিং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হুসেনের কাছ থেকে রেজিমেন্টাল ফ্ল্যাগ গ্রহণ করেন। ওই ঘটনার সাক্ষী অনেক সেনাপতি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রথম শিখ সেনাধ্যক্ষ রাজ্যপাল শ্রীসিং ১৯৬৪ সালে ভারতীয় সেনা বাহিনীতে যোগ দেন।

পূর্বোত্তর ৬টি রাজ্যের রাজধানীকে রেল লাইনে যুক্ত করার উদ্যোগ

সংবাদদাতা।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির রাজধানীকে রেল লাইনের আওতায় আনতে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে একথা জানান রেল দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আর ভেলু। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল শহরকে রেল লাইনের অন্তর্ভুক্ত করতে জিরিবাম-ইম্ফল ১২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রেল লাইন প্রকল্প মঞ্জুর হয়েছে। ২০১২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে রেল লাইন ইম্ফল রোড পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মেঘালয়-এর রাজধানী শিলং শহরকে রেল লাইনের সম্প্রসারণের আওতায় আনতে ত্রিশ কিলোমিটার দীর্ঘ আজারা বার্নিহাট রেল লাইন প্রকল্প মঞ্জুরী পেয়েছে। জরিপের কাজ শুরু হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ সাল নাগাদ ওই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অরুণাচলপ্রদেশের রাজধানী ইটানগরকে রেল লাইনের আওতায় আনতে ৩৩ কিলোমিটার দীর্ঘ হারমুটি-ইটানগর রেল লাইন প্রকল্পও অনুমোদন পেয়েছে। শুরু হয়েছে প্রয়োজনীয় জরিপের কাজ। নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমাকে রেলপথের আওতায় আনতে ৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ডিমাপুর-কোহিমা (জবুজা) লাইনের চূড়ান্ত জরিপের কাজ চলছে। কোহিমা পর্যন্ত লাইনটি সম্প্রসারিত করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। মিজোরামের রাজধানী আইজলকে রেল প্রকল্পের সুবিধাযুক্ত করতে প্রায় বাহান্ন কিলোমিটার দীর্ঘ ভৈরবী সাইরাং লাইন তৈরীর জন্য জরিপের চূড়ান্ত কাজ চলছে। সিকিমের রাজধানী গ্যাংটককে রেল লাইনে যুক্ত করতে রংপো-গ্যাংটক (৬০ কিলোমিটার) লাইন মঞ্জুর হয়েছে। ইতিমধ্যে ৫৩ কিলোমিটার লাইনের জরিপের কাজ শেষ হয়েছে।

পাহাড়ের বুক চিরে ছুটে চলেছে ট্রেন।

কংগ্রেসের এবারও বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করা শক্ত

দুর্গাপদ ঘোষ ।। মধ্যপ্রদেশ ভেঙে জনজাতি অধ্যুষিত ছত্তিশগড় রাজ্য গঠিত হয়েছে ২০০০ সালে। সেই থেকে রাজ্যে মোট ৯০ আসনের মধ্যে জনজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল ৩৪টি। ফলে রাজ্যে নির্বাচনে জেতা-হারাটা প্রায় পুরোপুরিভাবেই নির্ভর করে জনজাতির লোকেদের সমর্থনের ওপর। কিন্তু কংগ্রেসের ক্ষেত্রে সেই জায়গাতেই ধস নেমেছে গত বিধানসভা নির্বাচনে। অন্যদিকে ফসল তুলে নিয়েছে বিজেপি। এবার আসন পুনর্বিন্যাসে জনজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা কমে যাওয়ায় কংগ্রেসের ওপর জনজাতির লোকেরা আরও বেশি মাত্রায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই শ্রেণীর মানুষদের ক্ষোভের পারদ আরও ওপড়ে চড়ে যাওয়ার একটি বড় কারণ হল নকশাল বিরোধী গ্রামরক্ষী বাহিনী সালভা জুডুম নিয়ে প্রশ্ন তোলায়। সুপ্রিম কোর্ট সালভা জুডুম সম্পর্কে রাজ্যের রমণ সিং সরকারের কাছে তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। এখানকার জনজাতির লোকেদের স্থির বিশ্বাস এর পিছনে কংগ্রেসের ভূমিকা আছে, কমিউনিস্টদের প্ররোচনায় কংগ্রেসই বিষয়টিকে বিতর্কে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। অথচ নকশাল দৌরাত্ম্যে জেরবার বস্তার সহ বেশ কিছু এলাকার বনবাসীরা সরকারি মদতপুষ্ট সালভা জুডুমকে তাদের রক্ষাকর্তা হিসাবেই মনে করেন। নকশালদের সঙ্গে এই গ্রামরক্ষী বাহিনীর বেশ কয়েকবার সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে। অথচ এই রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধেই প্রশ্ন তুলেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস।

অন্যদিকে অবিভক্ত মধ্যপ্রদেশে জনজাতির লোকেদের মধ্যে সেবা প্রকল্প শুরু করেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অন্যতম সহযোগী সংগঠন ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। তারা একজন শিক্ষক পরিচালিত 'একল বিদ্যালয়' চালিয়ে ব্যাপক সাড়া পেয়েছে। চালিয়েছে অনেকগুলি চিকিৎসাকেন্দ্রও। জনজাতির লোকেদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূলস্রোতে নিয়ে

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রমণ সিং

আসার জন্য অনেকগুলি সংস্কার কেন্দ্রও স্থাপন করেছে। ২০০০ সালে ছত্তিশগড় রাজ্য গঠিত হবার পরও তা যথারীতি অব্যাহত রয়েছে। ফলে তার প্রভাব পড়েছে নির্বাচনেও। বলা যেতে পারে ছত্তিশগড়ে জনজাতিদের জন্য সংরক্ষিত বিধানসভা কেন্দ্রগুলোই ফলাফলের প্রধান নির্ধারক শক্তি। ১৯৯৮ সালেও এই ক্ষেত্রে মোট ৯০টি আসনের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল ৩৪টি। অর্থাৎ প্রায় এক তৃতীয়াংশ। রাজ্যে মোট জনসংখ্যা ২ কোটি ৮ লক্ষ। তার মধ্যে ৬৬ লক্ষ ১৬ হাজার জনজাতির লোক। তারা যেদিকে যাবেন, যাদের সমর্থন করবেন তাদেরই সরকারে বসার সম্ভাবনা এককথায় নিশ্চিত। ২০০৩ সালের নির্বাচনে ওই ২৯টির মধ্যে বিজেপি তুলে নিয়েছিল ২৫টি। বাকী ৯টি পেয়েছিল কংগ্রেস। সি পি আই ১৯৯৩ সালে ২টি আসন পেলেও ১৯৯৮ এবং ২০০৩-এ কোনও আসনে জিততে পারেনি। কংগ্রেস ১৯৯৩ সালে ১৯টি আসন পেয়েছিল। ১৯৯৮ তে ২টি বেড়ে হয়েছিল ২১টি। বিজেপি ১৯৯৮-এ জিতেছিল ১১ টিতে। ১৯৯৩-এ পেয়েছিল ১২টি আসন। ২০০৩ সালে তা দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে যায়।

এবার সংরক্ষিত আসন ৩৪টি থেকে ৫টি কমে গিয়ে ২৯টি হয়েছে। এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না জনজাতির লোকেরা। নকশাল সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তাদের ঝোঁক বাড়ছে বি জে পি'র দিকে।

ছত্তিশগড় রাজ্যটি আকারে ছোট হলেও উগ্রবাদী কমিউনিস্ট নকশালদের দৌরাত্ম্যের জন্য দু'দফায় নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফায় ৩৯ আসনে নির্বাচন হবে ১৪ নভেম্বর। বাকী ৫১ আসনে হবে ২০ নভেম্বর।

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রমণ সিং বস্তার জেলা সহ গোটা রাজ্যে সফর করেছেন। কিন্তু প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগী কার্যত নিষ্ক্রিয়। কংগ্রেসের বাকী নেতারাও দিশাহারা অবস্থায়। জনজাতি এলাকায় তাদের যাবার মতো মুখই নেই। এই অবস্থায় জনজাতির ভোট পাওয়ার ব্যাপারে বিজেপি এককথায় নিশ্চিন্ত। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অনুমান, গতবারের সংরক্ষিত ২৫টি আসন ধরে রাখতে পারলে রমণ সিংকে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে না।

জনজাতি ভোট নিয়ে চিন্তা নেই বিজেপির

সংবাদদাতা ।। পুনর্বিন্যাসের কারণে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা কমে যাওয়ায় কেন্দ্র সরকার তথা কংগ্রেসের প্রতি রাগে ফুঁসছেন মধ্যপ্রদেশের জনজাতির লোকেরা। ২৩০ আসনের রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচন ঘোষিত হয়েছে আগামী ২৫ নভেম্বর। ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে জনজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ৪১টি আসন জয়-পরাজয়ের নির্ধারক হতে পারে। কিন্তু রাজ্যে জনজাতি ক্ষেত্রে বিজেপি'র প্রভাব যে হারে বেড়েছে তাতে চিন্তার ভাঁজ মসৃণ হচ্ছে না কংগ্রেসের কপালে। এক্ষেত্রে ১৯৯৩ সালের পর থেকে বিজেপি লাগাতার কংগ্রেসকে ধরাশায়ী করে এগিয়ে গেছে। এবারও তার ইতর বিশেষ হবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

মধ্যপ্রদেশের মোট জনসংখ্যা হল ৬ কোটি ৩ লক্ষ। তার মধ্যে ১কোটি ২২ লক্ষ জনজাতির লোক। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার এক ষষ্ঠাংশেরও বেশি। প্রায় ১৭ শতাংশ জনজাতি ভোট যে কোনও দলের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৯৮ সালে অবিভক্ত মধ্যপ্রদেশে বর্তমান ছত্তিশগড় রাজ্যের এলাকাকে বাদ দিলে সংরক্ষিত আসন ছিল ৪৭টি। ১৯৯৩ সালেও তাই। তখন জনজাতি ভোট প্রায় একচেটিয়াভাবে ছিল কংগ্রেসের দখলে। ১৯৯৩ সালে কংগ্রেসের ঝুলিতে এসেছিল ৩৬টি আসন। বিজেপি পেয়েছিল মাত্র৪টি।

মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান

১৯৯৮-এ বিজেপি তার ঠিক তিনগুণ বাড়িয়ে নেয়। দখল করে ১২টি। কংগ্রেসের ৮টি কমে হয় ২৮টি। কিন্তু ২০০৩ সালের নির্বাচনে জনজাতির লোকেরা কংগ্রেসকে প্রায় বাতিল করে দেন। কংগ্রেস পায় মাত্র ২টি আসন। অন্যদিকে বিজেপি ১৯৯৩ সালে কংগ্রেসের লাভ করা আসনকেও ছাপিয়ে নিজেদের ঝুলিতে তুলে নেয় ৩৭টি। বাকী ২টি আসনের একটিতে জেতেন নির্দল প্রার্থী। কমিউনিস্টরা ১৯৯৩ থেকে একটি আসনেও জিততে পারেনি এইসব আসনে। যদিও মধ্যপ্রদেশে জনজাতি ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে নকশালদের দাপট বেড়েছে।

উমা ভারতীকে কেন্দ্র করে বিজেপি'র মধ্যে ডামাডোল দেখা দেওয়ায় বছর খানেক আগেও রাজ্য কংগ্রেস নেতারা যাকে বলে গোঁফে তা দিতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি তাতে বিজেপি প্রায় ঘর গুছিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকেকিন্তু কংগ্রেসের দশা সেই ছন্নছাড়াই। উমা ভারতীর সঙ্গে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিয়ে প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং দশ বছরের জন্য নির্বাচনী রাজনীতি থেকে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয়েছেন। তাছাড়া তিনি শারীরিকভাবেও সুস্থ নন। তার ওপর দলে কেন্দ্রীয় স্তরে দায়িত্ব নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে অন্যান্য রাজ্যে।

আর এক কংগ্রেসী নেতা অর্জুন সিং এখন এক কথায় নখদন্তহীন। রাজ্যে কংগ্রেস আগাম মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করার মতো অবস্থায় এখনও পর্যন্ত আসতে পারেনি। তার ওপর আসন পুনর্বিন্যাসে জনজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ছ'ছটি আসন কমে যাওয়ায় কংগ্রেসের পক্ষে জনজাতি ভোটারদের মন ফিরে পাবার কোনও আশা দেখছেন না কেউ-ই।

অন্যদিকে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান নিজের জায়গা ক্রমেই পোক্ত করে চলেছেন। ইতিমধ্যে চষে বেড়িয়েছেন প্রায় গোটা রাজ্য। জনজাতি ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। ওয়াকীবহাল মহলেরও বক্তব্য, মধ্যপ্রদেশে অন্তত জনজাতি ভোট নিয়ে বিজেপি'র চিন্তার কোনও কারণ নেই। তেমনই সংশয় নেই ক্ষমতায় ফিরে আশা নিয়েও।

বি এস পি'র নেতা বিজেপিতে

সংবাদদাতা।। উত্তর প্রদেশে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করল বিজেপি। রাজ্যে ক্ষমতাসীন বহুজন সমাজ পার্টি'র এক প্রতিষ্ঠাতা সদস্য গত ২৬ অক্টোবর ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিলেন। বি এস পি'র প্রতিষ্ঠাতা দলিত সদস্য এবং প্রয়াত কাশীরামের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিতি রমেশ চন্দ্র রতন বিজেপির রাজ্য সভাপতি রামপতি রাম ত্রিপাঠির উপস্থিতিতে পার্টির রাজ্য সদর দপ্তরে বিজেপিতে যোগ দেন। দু'দুবার বি এস পি টিকিটে হাত্রাস লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন রমেশ চন্দ্র রতন। রমেশ চন্দ্র সাংবাদিকদের বলেন, মায়াবতী দলিত ইস্যুকে অবহেলা করছেন।

তরুণ প্রজন্মের মেধাকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণের উপযোগী করে তুলছে কর্ণাটক

সংবাদদাতা ।। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং মেধার মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলতে চলেছে কর্ণাটক সরকার। কর্ণাটক সরকারের পক্ষ থেকে স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অরবিন্দ এন বুরজি বলেন, লঘু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে তারা স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রিনিউয়ার্স ইউনিভার্সিটি স্থাপন করতে চলেছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ভারতবর্ষের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে প্রতিভার অভাব নেই। বর্তমানে প্রচুর সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ইঞ্জিনীয়ারিং ও ম্যানেজমেন্টে সাফল্যের সঙ্গে পাশ করছে। তারা বেশির ভাগই চাকুরিতে যোগ দিচ্ছে। অথচ দেশে ক্ষুদ্র মাঝারি এবং লঘু উদ্যোগের সম্ভাবনা প্রবল। এই সকল কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের যদি উদ্যোগী করে তোলা যায় এবং সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবানো

যায় তাহলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন আসতে পারে।

এদিকে নজর দিয়েই শিল্প ও শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম তৈরি, ক্ষুদ্র শিল্পের উপযোগী যন্ত্রাংশ ও নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরিতে উৎসাহ দান, আর্থিক স্বয়ংম্ভরতার ভাবনা তৈরি ইত্যাদি ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যসূচীতে রাখা হবে বলে অরবিন্দ বুরজি জানান।

দেশের কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে এনিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প থাকলেও এমন ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের মতো উদ্যোগ এই প্রথম। কর্ণাটকের শিল্পমন্ত্রী বেঙ্কট রামানাপ্পার বক্তব্য অনুযায়ী, তরুণ প্রজন্মের উদ্যম এবং মেধাকে জাতীয়ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণের উপযোগী করে তোলার এক সদর্থক প্রয়াস হবে এই উদ্যোগ।

পথ তুমি কার ?

নবকুমার ভট্টাচার্য

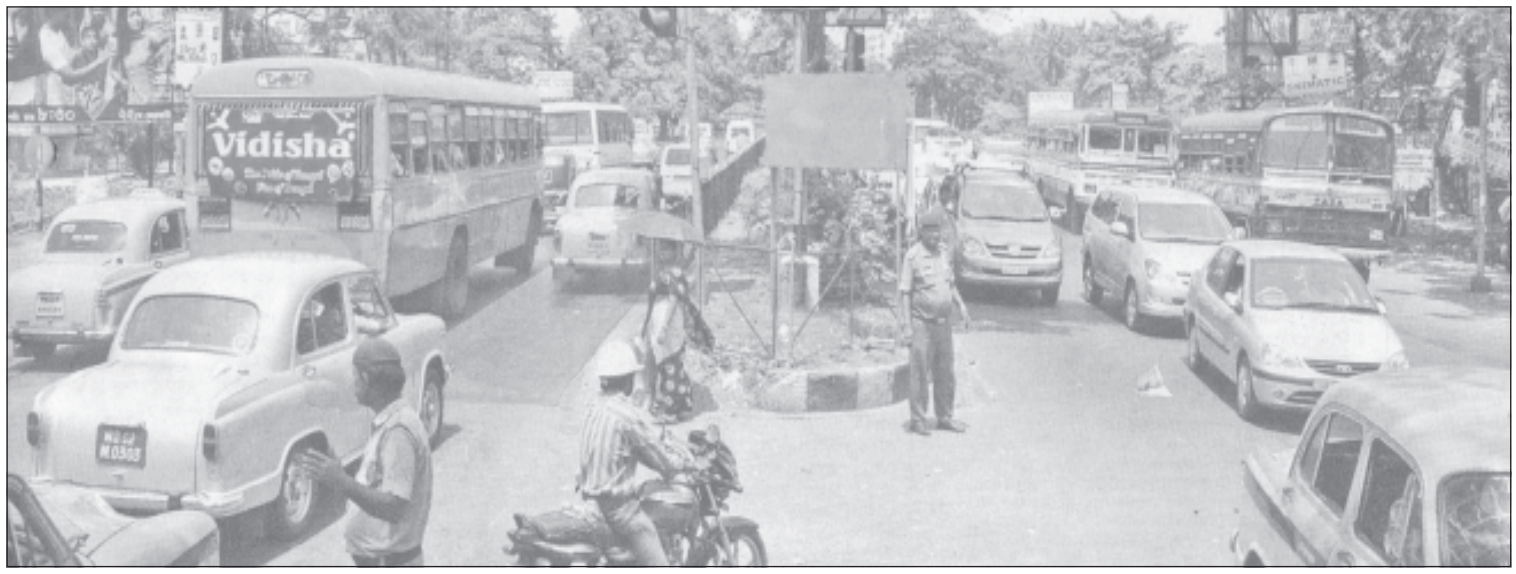

বছর দশেক আগের এক পথ দুর্ঘটনা চাক্ষুষ করে বোধোদয় হয়েছিল কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সুব্রত মুখার্জীর। রাস্তা পেরতে গিয়ে বাসের চাকায় মা আর তার ছোট্ট এক মেয়েকে পিষে যেতে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, মানুষের জীবন কত মূল্যহীন। একই রকম অভিজ্ঞতা জয়েন্ট কাউন্সিল অব বাস সিন্ডিকেটের হর্তাকর্তা সাধন দাসের। ১৮ হাজার বাস মালিক যে সিন্ডিকেটের সদস্য তার কর্মকর্তা তিনি।

সচেতনা বাড়ানোর কথা সবাই বলছেন। এ শহরে বেশির ভাগ মানুষই যদি সচেতনতার কথা ভাবতেন তাহলে পথ দুর্ঘটনা কম হত। গাড়ি চালকদের জন্য নানা নির্দেশিকা থাকলেও সব চালক সচেতন নন। ২০০০ সালে কেবল কলকাতা শহরে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ৪৬২ জন। এঁদের মধ্যে পথচারীর সংখ্যা ৪০৭। ২০০১ সালে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ৪৪০ জনের। তাঁদের মধ্যে পথচারী ৩৭৬ জন। ২০০২ সালে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ৪৯০ জনের। ২০০৬ সালে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫২০ জনের আর ২০০৭ সালে ৪৬৭ জনের। এই পরিসংখ্যান আসলে কিছুই বলে না কারণ এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝানো যায় না বাস্তব অবস্থাটা।

কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের মতে — লোকে রাস্তায় নামছে, গাড়ির গতি কমছে তাই বাড়ছে দুর্ঘটনা। অতএব জনতাকে ফুটপাতে তোলো। কিন্তু কোথায় ফুটপাত ? সে তো হকারের দখলে। কিছুদিন ধরে হকারদের সঙ্গে প্রশাসনের একটা লুকোচুরি খেলা হল। এবং শেষে জিত হল হকারদের। হকারদের হঠানো সহজ কথা নয়। তাই ফুটপাত হকারদের দখলেই রইলো। এর সঙ্গে রাস্তা খোঁড়া। রাস্তা খোঁড়া হচ্ছে সি ই এস সি, টেলিফোন, কে এম ডি এ এর নামে। কিন্তু খোঁড়া রাস্তা সারাই হতে মাসের পর মাস চলে যায়। কলকাতা শহরের রাস্তার পরিমাণ ১১ শতাংশের কিছু বেশি। অথচ একটা শহরের অন্তত ২৫ শতাংশ রাস্তা না থাকলে সেটা মেট্রো শহরের পর্যায়ে পড়ে না। কলকাতা মহানগরীর ৯০ শতাংশের বেশি রাস্তার দায়িত্বে রয়েছে পুরসভা।

কলকাতার পাশেই হাওড়া পুরসভা হকার নগরী নামে খ্যাত। কলকাতাকে হকার মুক্ত করার কথা ভাবা হলেও হাওড়ার কথা খুব একটা ভাবা হয়নি। এজন্য হাওড়া শহরতলিতে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যাও বেশি। গত বছর কেবল শহরতলি হাওড়াতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩০৭ জনের। ট্রাফিক পুলিশের মতে, যে কোনও কাজের দিনে আমরা গড়ে সাড়ে তিন থেকে পাঁচ লক্ষ পথচারী সামলাই। এত কিছুর পরেও যে দুর্ঘটনার সংখ্যা কম রয়েছে সেটাই ভাগ্যের।

বাস মিনিবাসের রেষারেষিতে প্রাণ যায় মানুষের অথচ কিছুই করার থাকে না। বাসে কমিশনের ভিত্তিতে রোজগারের প্রথাটা তুলে দিলে রেষারেষিটা এড়ানো যেত। কোনও চালকই যদি দিনে আট ঘন্টার বেশি গাড়ি চালাতে না পারেন এমন ব্যবস্থা থাকলে দুর্ঘটনা কম হবে। এসব প্রস্তাব রূপায়ণ করবেন কে ? বেলতলায় মোটর ভিহিকল্‌সের ঘুঘুর বাসা কি ভাঙা যায় না। ফুটপাতে হকার আর পথে অটোর দৌরাত্ম্য এসব রোধ করবে কে ?

পথ তুমি কার ? স্বাধীনতার পরে এই প্রশ্নের উত্তর একটাই ছিল, জনসাধারণের। এখন উত্তর হবে 'টোলদাতার'। এই পশ্চিমবঙ্গেও টোল দিলে তবেই ব্যবহারের সুযোগ মেলে এমন রাস্তা চালু হয়ে গিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ হাওড়ার বোম্বে রোডে ধূলাগড়ে টোল আদায় করা হচ্ছে। সড়ক কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ? একটি পরিসংখ্যান থেকে এর উত্তর মেলে। ১৯৫১ সালে দেশের মোট পণ্যের তিন চতুর্থাংশ রেলপথে চলাচল করত। দেশে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে গাড়ি এবং রাস্তার কদর। এখন ৬৫ শতাংশ পণ্য ও ৮৫ শতাংশ যাত্রী চলাচল করে সড়কপথে। তবে মোট রাস্তার ২ শতাংশের চেয়ে কম হলেও সড়কপথে যানবাহনের ৪০ শতাংশেরও বেশি জাতীয় সড়ক ব্যবহার করে থাকে। এসব কথা চিন্তা করেই অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার সড়ক উন্নয়নে এক বিশাল প্রকল্প হাতে নিয়েছিল যার সুবিধা আমরা এখন ভোগ করছি। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিন্‌হা বিপুল আর্থিক চাপের মুখে যে বরাদ্দ মেনে নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী সে ব্যাপারে একেবারেই অসহায়। কারণ রাজ্য সরকার মোট রাজত্বের ৮৫ শতাংশ সরকারি কর্মীদের বেতনে খরচ করে উন্নয়ন করবে কীভাবে ? রাস্তার অবস্থা তাই বেহাল পশ্চিমবঙ্গে। ম্যাকিনসে এ্যান্ড কোম্পানির হিসাব অনুযায়ী প্রত্যেক বছর এরাজ্যে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা লোকসান হয় শুধু বেহাল রাস্তা ও পেট্রাপোলে উপযুক্ত পার্কিং সুবিধা না থাকার জন্য।

সড়ক পরিকাঠামোর উন্নতি না হলে

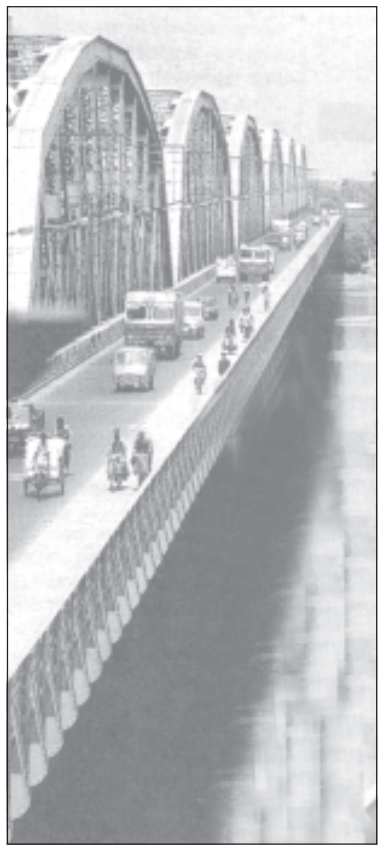

সড়ক পরিকাঠামোর উন্নতি না হলে শিল্প আসবে না। পরিকাঠামো আগে না শিল্পায়ন ? সামগ্রিকভাবে শিল্পমহল আগে চায় পরিকাঠামো। কারণ আধুনিক রাস্তাঘাট না থাকলে শিল্প গড়ে উঠবে কিভাবে ? এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা ফুটে বেরুচ্ছে।

শিল্প আসবে না। পরিকাঠামো আগে না শিল্পায়ন ? সামগ্রিকভাবে শিল্পমহল আগে চায় পরিকাঠামো। কারণ আধুনিক রাস্তাঘাট না থাকলে শিল্প গড়ে উঠবে কীভাবে ? এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা ফুটে বেরুচ্ছে। টাকার অভাব হয়তো রয়েছে, কিন্তু চিন্তার দৈন্যতাও কম দায়ী নয়। বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়ার রাস্তাঘাট কি যথেষ্ট উন্নত হয়েছে এই তিরিশ বছরে ? ভোটের লোভে অপরিকল্পিত ভাবে অটোর লাইসেন্স দিলেই কি সরকারের সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় ? অপরিকল্পিত ট্রাফিক আইন। যেমন বাস দুর্ঘটনায় পড়লে, ট্রাফিক আইন ভেঙে জরিমানা হলে তা মেটানোর দায়িত্ব কিন্তু চালক বা কন্ডাক্টরের নয়, মালিকের। তাই বাসচালকের কোনও দায় ও দায়িত্ব নেই। চালকের মনস্তত্ব দেখবে কে ? ক্ষমতা ও টাকা থাকলে গাড়ি চালানো না শিখেই যে কেউ পশ্চিমবঙ্গের ট্রাফিক মানচিত্রের অংশ হতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে ট্রাফিকের কোনও ছন্দ নেই। রাস্তা ছেয়ে গেছে বিদেশি গাড়িতে আর রাস্তা বিপর্যস্ত দেশি ড্রাইভিংএ। সবাই আগে যাবে অন্যকে যত দূর সম্ভব চেপে দিয়ে। এই হল পথচরিত্র।

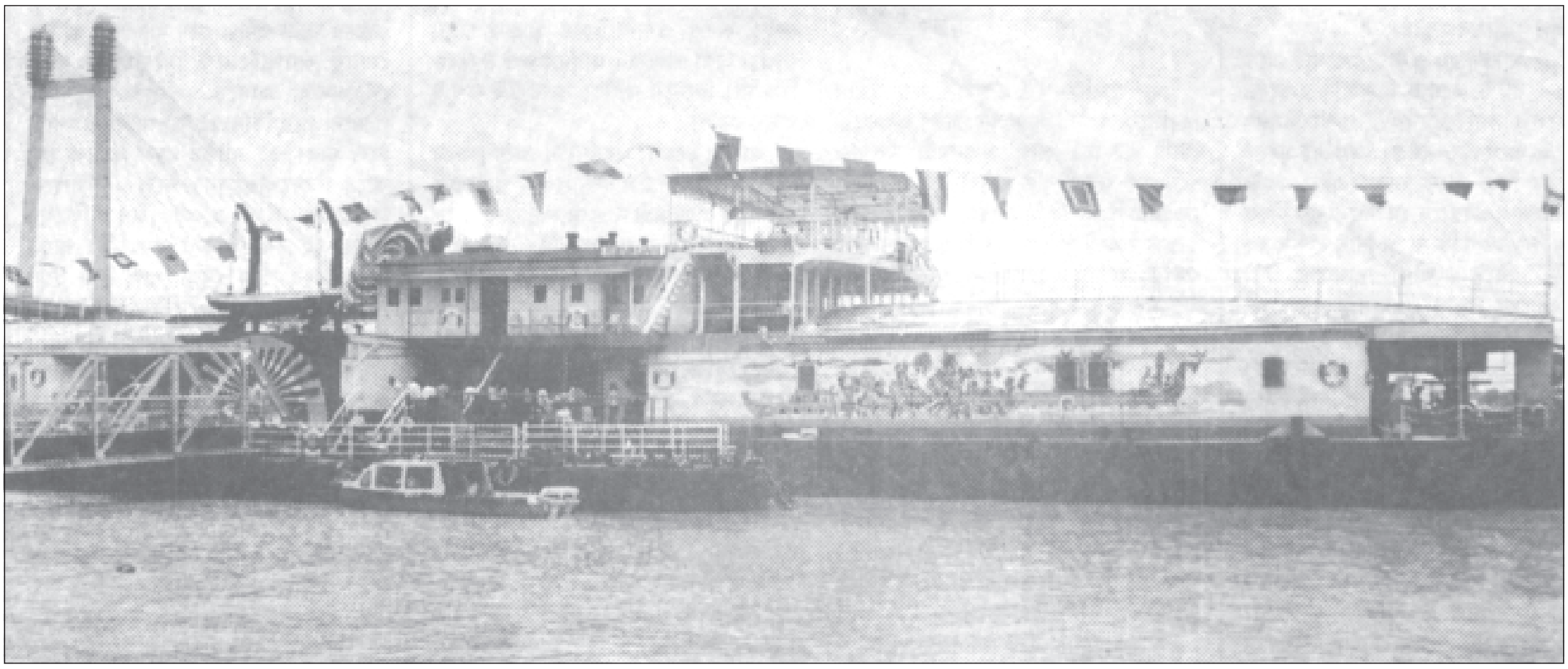

জল পথের কোনও বিকল্প নেই

বিজয় বন্ধু ব্যানার্জী

ভারতবর্ষের জলপথের ইতিহাস আমাদের অনেকেরই খুব একটা ভাল ভাবে জানা বা স্বচ্ছ ধারণা নেই (প্রাথমিক তদন্তে যা পাওয়া বা বোঝা গেছে)। আমরা জানি যে এ দেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথম জলপথ ধরেই আসে। কিন্তু ঠিক তার আগের ইতিহাস আপনারা জানেন কি? সে সময় এলিজাবেথ ইংলন্ডের রানী। ওই সময় সমুদ্রের আতঙ্ক বা ত্রাসের আর এক নাম "ড্রেক"। এই ড্রেক ছিলেন একজন জলদস্যু। তিনি ইংলন্ডের রানী এলিজাবেথকে প্রচুর পরিমাণে লুণ্ঠিত ধনসম্পদ দিয়েছিলেন। ইংলন্ড সেই সময় ঋণে ঋণে জর্জরিত। রানী এলিজাবেথ সেই লুণ্ঠিত ধন সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধ করেন ও ইংলন্ডকে ঋণ মুক্ত করেন। লুণ্ঠিত ধন সম্পদ থেকে কিছু— ৪০-৪৪ হাজার পাউন্ড দেন এই জল পথ ব্যবহারের জন্য, এক ব্যবসায়ী কোম্পানীকে। তারও পরবর্তী কালে আসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চলে যাওয়ার পর আসে আই জি এন আর এবং আর এস এন।

আর এস এন কোম্পানী ব্যবসা বাণিজ্য করার ফলে নদী পথের দুই ধারে নানারকম শিল্প গড়ে ওঠে। শিল্প গড়ে ওঠার সাথে সাথে মানুষের যাতায়াতের সুবিধাও হয়। তখনকার দিনে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় নানান জায়গায়। সুতরাং যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায় দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করাও সহজ হয়ে যায়। তারপর এরা দেখল জাহাজ চালাতে গেলে তার মেরামতি দরকার। তখন জাহাজ বানানো ও মেরামতির কারখানা তৈরী করা হল, তার নাম "রাজাবাগান ডক ইয়ার্ড"। তখনও কলকাতা ডক বা গার্ডেনরীচ তৈরী হয়নি। তখন এই কারখানায় যত জাহাজ তৈরী হত বেশীর ভাগ জাহাজই নেভির জন্য যুদ্ধ জাহাজ। তবে নিজের কোম্পানী চালাবার জন্য কিছু জাহাজ তৈরী ও মেরামতি করত। এই কোম্পানীর জাহাজ যাতায়াত শুধু কলকাতাতেই তা নয় — বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশ (প্রেসিডেন্সি জোন) এবং বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে সুদূর অসম প্রায় তিববতের কাছে এবং বার্মা পর্যন্ত। এই সংস্থা তখন রমরমা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। পরবর্তীকালে যখন বৃটিশ ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যায় তখন তারা দেখল তাদের এত বড় জাহাজ কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-কাছারি এবং ভূ-সম্পত্তি-র রক্ষণাবেক্ষণ করারও দরকার আছে। এত বড় বিশাল সম্পত্তি (সাম্রাজ্য) রক্ষণাবেক্ষণ কে করবে? বৃটিশরা ছিলেন রক্ষণশীল। তাই তাদের চিন্তাধারা রক্ষণাবেক্ষণের দিকে। তারা চিন্তা করে দেখল অন্য কাউকে বা কোনও কোম্পানীকে দিলে তারা চালাতে পারবে না। তখন তারা সরকারের অধীনে এর দায়-দায়িত্বের পরিচালন ভার দিয়ে যায় মাত্র এক পাউন্ডের বিনিময়ে অর্থাৎ উপহার স্বরূপ। তৎকালীন দিনের ৪০-৪৪ হাজার পাউন্ডের জিনিস ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস, কাছারি, ভূ-সম্পত্তি এক পাউন্ডের বিনিময়ে। তাও ২৫০ বৎসর আগে। এখন এর মূল্য অনেক?

ভারত সরকার এই কোম্পানীর নাম রাখল সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (সি আই ডবলিউ টি সি লিমিটেড)। বেশ কিছুদিন জাহাজ চলাচল করল, ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে থাকল। এর মাঝে আর একটি কোম্পানীর জন্ম হল — তার নাম (আই ডবলিউ এ আই) ইনল্যান্ড ওয়াটার অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। এই কোম্পানীর কাজ শুধু নদী পথে ড্রেজিং করা ও মার্কা দেওয়া।

আমার প্রশ্ন, তারা কত ড্রেজিং করেছে কত মাটি কেটেছে, গঙ্গার ড্রেজিং-এ কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার জবাব চাই।

আমাদের মতে এক ইঞ্চি ও মাটি কাটা হয়নি, আর যদি কাটা হয়েও থাকে তা গঙ্গায় ফেলা হয়েছে। আমরা এই হিসাবের খতিয়ান চাই।

গঙ্গার জলধারা কমে গেছে এবং বিষাক্ত হয়ে গেছে, বিশেষজ্ঞরাও শিকার করে। কিছু মন্ত্রী ও আমলারা দেখল নতুন কোম্পানী দেখিয়ে যদি সি আই ডবলিউ টি সি হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

রাজাবাগান ডক ইয়ার্ড, জি আর এস ই-কে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কত মূল্যের বিনিময়ে? অসমের পান্ডু পোর্ট কেড়ে নিয়ে — আই ডবলিউ এ আই-কে দিয়ে দিল কার স্বার্থে এবং কোন আইনে।

ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখে কোনও কথা নেই, মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে।

এসব আপনাদের জানানোর কারণ কি বা এর সঙ্গে সম্পর্কই বা কি? এই নদী পথের ধারে যে শিল্প গড়ে উঠেছে তার মধ্যে লোকজনের কর্ম সংস্থান হয়েছে। সাধারণ মানুষ কাজকর্ম করায় সেসব জায়গায় বাজার হাট দোকানপাট গজিয়ে উঠেছে। লোকের রুটিরুজি হয়েছে। রুটিরুজির মাধ্যমে তারা পরিবার প্রতিপালন করছে।

আজকাল ঠিকা শ্রমিক প্রসঙ্গে অনেক কথা শুনি, নানান জায়গায় নানা সংগঠনের সম্মেলন হয়। নানান রকমের বক্তব্য রাখা হয়। এসব লেখার কারণ কি ভেবে দেখেছেন? আমরা একজন আর একজনের সঙ্গে কোনও না কোনভাবে জড়িত।

আজকের দিনে স্থায়ী কর্মীদেরই চাকুরীর অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। তাই ঠিকা শ্রমিক প্রসঙ্গ উঠছে। ঠিকা শ্রমিকরা যারা আছেন চিন্তা করে দেখুন, যে কথা বলছি তার যুক্তি কতটা আছে। একদিকে ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার ন্যূনতম মজুরীর কথা বলে অথচ আর একদিকে ঠিকা কাজ করাচ্ছে।

ঠিকা কাজে ন্যূনতম মজুরি কত?

ঠিকা কাজ করে কত পায়? একটু দেখা যাক।

ন্যূনতম মজুরি ধরা যাক - ৮০টাকা।

তাহলে মাসে ৮০ ৭ ৩০ - ২৪০০.০০টাকা।

সেখানে ঠিকা কাজে কাউকে ১১০০, ১২০০, ১৫০০ টাকা দেওয়া হয়। তাহলে দেখুন আপনারা কথা বলার সাথে কাজের মিল কোথায়? মিল আছেনা নেই। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সময়ও চুরি করছে। কি রকম দেখা যাক — ঠিকা শ্রমিকদের খাটিয়ে নিচ্ছে — ১০-১২ ঘন্টা। ঠিকা শ্রমিকদের পি এফ, গ্র্যাচুইটি, পেনশন, মেডিকেল ও ছুটি কিছুই নেই। মে দিবস ঘটা করে পালন করা হয়। মে দিবস শ্রমিক দিবস হিসাবে পালন হয় অথচ শ্রমিকের স্বার্থই দেখা হয় না। শ্রমিক দিবসের ইতিহাসটা কি একটু পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। আট ঘন্টা কাজের জন্য লড়াই ও আন্দোলন শুরু হয় এবং এই আন্দোলনে বহু শ্রমিক প্রাণ হারান, পরে সেই আন্দোলনকে মালিকপক্ষ মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং আট ঘন্টা কাজ চালু হয় — এই তো মে দিবস।

আজকের দিনে ভারত সরকার ডিজেল লরির সাথে (ডিজেল পরিবহন) হাত মিলিয়ে ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্টকে ধ্বংস করছে।

সি আই ডবলিউ টি সি-র জাহাজ কলকাতা থেকে ছেড়ে ডায়মন্ডহারবার হয়ে নামখানা দিয়ে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশ হয়ে সুদূর অসম যায়। এই পথে জলঙ্গী নদী। এখন এই নদীর ডাক নাম খড়ি গঙ্গা, এই জলপথ ধরে বাংলাদেশ যেতে অনেক কম সময় লাগবে এবং জ্বালানী কম লাগায় কম খরচে মালপত্র বেশী যাবে। খরচ অর্ধেকেরও কম লাগবে। আমরা চাই ডিজেল পরিবহনের সঙ্গে পাল্লা দিতে।

আগে এই জলপথ ধরেই জাহাজ যাতায়াত করত, আর এই নদীপথ ড্রেজিং করত পোর্ট কমিশন। এই নদী পথ পোর্ট ট্রাস্ট কে দিয়ে ড্রেজিং করিয়ে জলঙ্গী নদীর পুনরুদ্ধার করে এই পথে অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন চালু করা হোক। (সি আই ডবলিউ টি সি) এই সংস্থা বাঁচলে নদী পথের দুই ধারে শিল্প আবার চাঙ্গা হবে ও কর্ম সংস্থান হবে। আমাদের দেশের বেকার সমস্যা এক অভিশাপ, এই অভিশাপের হাত থেকে বাঁচার একটাই পথ শিল্প গড়ে তোলা। 'রাষ্ট্র হিত মে করেঙ্গে কাম, কামকে লেঙ্গে পুরা দাম' — স্লোগান দেওয়া যত সহজ, কাজে রূপ দেওয়া ততই কঠিন। কারণ এদেশে শিল্প নীতি ও শ্রমিক নীতি দুই শ্রমিক বিরোধী।

আজকের দিনে জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে, আকাশ ছোঁয়া। কোনও রকম আন্দোলন নেই, কেউ আন্দোলন করলেই ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার চিৎকার করে বলে ওঠে উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কিন্তু

(এরপর ১৩ পাতায়)

মিথ্যার মরুদ্যানে

টাটা বাই বাই, রাজনীতি করে চলো, পশ্চিমবঙ্গকে লুটে-পুটে খাই। খুব কষ্ট হয়। কান্না পায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতাদের কাজকর্ম দেখে। নেতিবাচক ধর্মহীন রাজনীতির আতুর ঘর হয়ে উঠেছে আজ পশ্চিমবঙ্গ। কথায় কথায় ধর্ষণ, মারামারি, খুন ও গণপিটুনিতে মানুষকে হত্যা করা, পুলিশের অত্যাচার সবই আজ বাংলার রোজনামচা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার খুব ইচ্ছে হয় প্রশ্ন করবার। প্রশ্ন করতে চাই পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে সাংসদ সবাইকে। আপনারা নিজের বুকে হাত দিয়ে, আয়নার সামনে নিজের চোখে চোখ রেখে বলতে পারবেন কী আজ আপনারা যে রাজনীতি করছেন সেটা কতটা সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং কতটা নিজের স্বার্থে?

তবে আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি যারা রাজনীতি করেন তারা সবাই মানুষ হিসেবে খারাপ নন। কারণ আমরা সবাই ভগবানের সন্তান — আমরা অমৃতের পুত্র। ব্যক্তির ও পার্টির চিন্তা-ভাবনা ভালোমন্দ কাজের জন্য দায়ী। বাংলার সব রাজনৈতিক দল চিন্তা-ভাবনা করছেন কীভাবে বাংলার উন্নয়ন করা যায়। চিন্তাতো করতেই হবে, কারণ রাজনীতি যখন আপনাদের পেশা তখন মানুষের সেবায় কাজ করাও আপনাদের কর্তব্য। এর জন্য MLA, MP Ý Councillor সবাই বেতন পান।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ৩০ বছর পর আওয়াজ তুলেছে, 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'। সর্বহারারা ৩১ বছর ঘুমোচ্ছিলেন নাকি? ৩১ বছরে কত হাজার শিল্প কারখানা বন্ধ করেছেন তার হিসাব কখনও করেছেন কি? কয়েক বছর আগে আপনাদের স্লোগানটা কি ছিল? মিথ্যা আমাদের ভিত্তি, পার্টি আমাদের ভবিষ্যৎ। কি, সর্বহারা দাদারা ভুল বললাম? নেতাজীকে অপমান করে ইংরেজদের দালালী করার জন্য তোজোর কুকুর কারা বলেছিলেন? কথাটা মিথ্যা ছিল তাই নেতাজীর জন্মশতবর্ষে দমদম বিমান বন্দর নাম পরিবর্তন করে নেতাজীর নামে করার অনুষ্ঠানে তৎকালিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ভুল স্বীকার করেছিলেন। আপনাদের মিথ্যার বহু উদাহরণ আছে যা লিখতে গেলে উপন্যাস তৈরি হয়ে যাবে। যার নামকরণ করতে হবে — মিথ্যার মরুদ্যান। আপনাদের মিথ্যা কথা বলে ক্ষমা চাওয়াটা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়।

মিথ্যা আপনারা চিন্তা করে গবেষণা করে বলেন, যখন মিথ্যা প্রচারে আপনাদের পার্টির রাজনৈতিক লাভ হবে। তাই তো বলুন বার বার "মিথ্যা আমাদের ভিত্তি, পার্টি আমাদের ভবিষ্যৎ"। কারণ আপনারাই তো বলেন বন্ধুর থেকে পার্টি বড়।

পশ্চিবাংলায় শিল্পায়ণ করার চিন্তা আপনারা আরো কুড়ি বছর আগে করেননি কেন? সমস্ত ভারতবর্ষ যখন এগিয়ে গেল তখন আপনাদের ঘুম ভেঙেছে। কম্পিউটারের অন্ধ বিরোধিতা (কমিউনিষ্টরা) করেছিলেন পশ্চিমবাংলায়, আপনাদের জন্য আজ পিছিয়ে পড়ল পশ্চিমবঙ্গ। এখন নাকে কাঁদছেন তখন ভুল হয়েছিল। ভুল আপনাদের কবার হয় দাদা? মনে রাখবেন মিথ্যাচার ও ভন্ডামির একটা সীমা আছে, পাপ বাপকেও ছাড়ে না। হতে পারে পরলোকে গিয়ে আপনারা স্বীকার করবেন কমিউনিষ্ট পার্টি করাটা ভুল হয়েছে কারণ, ভুল স্বীকার করাটা আপনাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনাদের ভুলের জন্য কয়েকটা প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত। শিক্ষাকে আপনারা শেষ করেছেন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এখন ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রশাসন এখন প্রহসন হয়ে গেছে। মানুষকে ভাগ করেছেন আমরা ওরা বলে।

মানিক দে, তিলজলা, কলকাতা-৩১

জনতা জনগণেশ

একথা এখন আর রাজনীতি সচেতন কোনও ব্যক্তিরই জানতে বাকি নেই যে ভারতের পরাধীনতার অভিশাপ মুক্তির পেছনে এক বিরাট অসম সাহসী সিংহহৃদয় বীরের কার্যকলাপই দায়ী, শুধুমাত্র কংগ্রেসের অহিংস নীতির সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি।

স্বগৃহে বন্দী থাকাকালীন ইংরাজের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কাবুলীর ছদ্মবেশে সুভাষ চন্দ্র বসু গভীর রাত্রে দেশত্যাগ করলেন। সেদিনটি ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। তিনি গেলেন একা।

সমস্ত গুজব ও জল্পনার পর যুদ্ধের হাজার হাজার আজাদ হিন্দ সেনাকে যুদ্ধাপরাধের জন্য ভারতে আনা হল। তখন এইসব সেনারা সুভাষচন্দ্রের প্রেরণায় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অসম লড়াই-এ কি বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল তা প্রকাশ পেলে সারা ভারত যেন পাগল হয়ে উঠল। পথে পথে উত্তাল জনসমুদ্রের বিনাশর্তে আজাদ হিন্দ সেনাদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন। বেগতিক দেখে যেসব নেতারা বন্দুক হাতে নেতাজীর সম্মুখীন হবার আস্ফালন করেছিলেন (নেহরু ও তাঁর চেলাচামুণ্ডারা) তারা তাড়াতাড়ি ডিগবাজী খেয়ে হাঁটু গেড়ে করজোড়ে নেতাজী বন্দনা শুরু করলেন। তিন সপ্তাহ এই জনসমুদ্রের মতিগতি লক্ষ্য করে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সেনাপতি অচিনলেক পর পর দুটি চিঠি লিখে ইঙ্গিত করলেন যে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মেরুদণ্ড নেতাজী ভেঙে দিয়েছেন। দেশের লোক ও ভারতীয় সেনারা নেতাজীকেই শ্রেষ্ঠ নেতা ও দেশপ্রেমিক মনে করে অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্যদলে বিদ্রোহের সম্ভাবনা (কালীচরণ ঘোষ প্রণীত The roll of Honour দ্রষ্টব্য) নেতাজী তখন কোথায় সেটা অজানা। রটানো হয়েছিল বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে ভারতের স্বাধীনতা রূপ ফলটি টুপ করে কোলে পড়বে বলে আগা খাঁ প্রাসাদে যে সব ক্ষমতালোভীরা আরামে বিলাসে দিন কাটাচ্ছিলেন, তাঁরা সক্রিয় হয়ে উঠলেন। নেতাজীর খোঁজ নেই, অতএব জওহরলালই নেতা। নেতাজীর নাম জপ করে বিরাট জয় পেলেন। কিন্তু ভারতবিভাগ রোধ করা গেল না — কারণ বৃটিশরা সেটা চেয়েছিল?

তাদের খেলা শুরু হল। হঠাৎ শুনলাম মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয় এ কিরে বাবা! এ কি রকম স্বাধীনতা? ক্ষমতা পিশাচ। (সুশীল পাঠক, ক্ষমা করবেন। অর্থ পিশাচ যদি হয় ক্ষমতা পিশাচ হবে না কেন? এরকম উপযুক্ত শব্দ আর হয় না।)

স্বাধীনতার তারিখ নিয়ে লাগল বিরোধ। মাউন্টব্যাটেন জেদ ধরলে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট (এক বৎসর আগের ১৬ আগস্টের কথাটা খেয়াল রাখবেন)। ভারতীয় মেরুদণ্ডহীন নেতারা বুঝলেন এটা বিপজ্জনক হতে পারে। মাত্র এক বৎসর আগের ভয়াবহ দাঙ্গার স্মৃতি জেগে উঠবে তাই তারা আপত্তি করলেন। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন তাঁর জেদ ছাড়লেন না। তিনি জাঁক করে বললেন I am a military man, জানি কি করে সামলাতে হয়। আমার সৈন্যবাহিনী বিমানবাহিনী সব প্রস্তুত থাকবে।

কার্যত যখন লাশভর্তি ট্রেন বিভক্ত ভারতের মধ্যে যাতায়াত করতে লাগল। তখন কিন্তু একটি প্লেনও চোখে পড়ল না, সৈন্যরা কেবলমাত্র মুদ্দোফরাসের কাজটুকু করলো, ব্যস।

কিছুদিন যাবৎই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তান উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। সর্বত্র স্লোগান 'হঁসকে লিয়া পাকিস্তান লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্তান" (অনায়াসে পাকিস্তান নিয়েছি, লড়াই করে এখন হিন্দুস্থান নেব)।

মাউন্টব্যাটেন জানতেন না এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। তাঁর বা তাঁর ওপরওলাদের উদ্দেশ্যই ছিল ইংরাজ ভারত ছাড়লেই গৃহযদ্ধ শুরু হবে এটা দেখিয়ে দিতে হবে। ২২ লক্ষাধিক লোক দাঙ্গায় নিহত হয়।

ইংরাজ জাতির প্রশংসা অনেকেই করেন কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের নীচতার তুলনা নেই। বারাসতের কাছে নীলগঞ্জে প্রায় ৩০০ আজাদ হিন্দ সেনাকে কুকুরের মত গুলি করে মারা হয়েছিল। কিছু প্রাচীন লোক এখনও সাক্ষী আছেন।

আশ্চর্য এই যে ফরওয়ার্ড ব্লক নামধারী দলটি নেতাজী সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। লোকসভায় স্বাধীনতা সংগ্রামের নামের তালিকা থেকে প্রতিভা পাটিল নেতাজীর নাম বাদ দিলেন। সবাই চুপ, ফরওয়ার্ড ব্লকও। মানুষ এত অকৃতজ্ঞও হয়!

ভারতের জনগণ নিরীহ, সহিষ্ণু। হিন্দীতে জনতাকে বলা হয় জনগণেশ অর্থাৎ হাতী, শান্ত-নিরীহ, কিন্তু যদি ক্ষেপে যায় তো রক্ষা নেই। জনগণেশ ক্ষেপেছিল ১৯৭৭-এ।

জরুরী অবস্থার পেষণে জনতা তখন এখন খেপেছিল কোনও প্রচারে নয়, অসংগঠিত বিরোধী দল মহাপ্রতাপান্বিতা ইন্দিরা গান্ধী থেকে সঞ্জয় প্রত্যেককে কার্যত সদলে শুঁড়ে তুলে আছাড় মেরেছিল যা কেউ ভাবতে পারেনি। আমরা রাত অবধি এক একটা খবর শুনছিলাম আর অবিশ্বাস্য আনন্দে চমকে উঠেছিলাম — ভাবা যায় না। দুঃখের বিষয় কিছু স্বার্থসন্ধানী নির্বুদ্ধি দলের জন্য এ অবস্থা স্থায়ী হয়নি — যদিও উপযুক্ত লোক ছিল।

আমার আশা আবার তেমন হবে। জনগণেশ জাগছে। দুর্নীতির পঙ্কে আবদ্ধ মন্ত্রীর দলকে জাগ্রত জনগণেশ আবার তেমনি করে আছাড় মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবে যাতে আর উঠতে না পারে।

কুন্তলা দত্ত, পূর্বাচল, সল্ট লেক, কলকাতা।

যত হাহাকার রিজওয়ানুরের জন্য, অন্যরা ফালতু!

ঘটকপর

রিজওয়ানুর রহমানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এক বছরেরও আগে। সে ঘটনায় শোকাহত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমজীবী মানুষেরা। মমতাজ বানুর নেতৃত্বে এইসব শোকার্ত লোকজন রাস্তায় নেমে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। মৌন মিছিল করেছেন অশোক টোডির মুন্ডপাত করেছেন। রিজওয়ানুর রহমানের মা কওসর জাহানকে সমবেদনা জানাতে দলে দলে রিজওয়ানুর রহমানের তিলজলা লেনের বস্তিতে উপস্থিত হয়ে অশ্রু বিসর্জন করেছেন। এক বছর অতিক্রান্ত হলেও তাদের সে শোক এতটুকু প্রশমিত হয়নি, অশ্রু বিসর্জন বন্ধ হয়নি।

অথচ গত আগস্ট মাসে বহরমপুর থানার প্রত্যন্ত গ্রাম লক্ষণপুরে ৩২ বছরের শৈলেন্দ্র প্রসাদকে মুণ্ডু কেটে হত্যা করে গ্রামেরই পাটক্ষেতে পুঁতে দেওয়া হয় কারণ সে হিন্দু। ধর্মান্তরিত না হয়ে সে ওই গ্রামেরই ২৫ বছরের মনেরা খাতুনকে বিবাহ করেছিল রেজিস্ট্রি করে। এদের এক শিশু পুত্রও রয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি মমতাজ বানু বা অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা। বারাসতের চৌধুরী পাড়ার বাসিন্দা অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেছিল মুসলিম তনয়া রেহানা সুলতানাকে। তাই রেহানার দাদা মনিরুল ইসলাম অর্কর শরীরে কেরোসিন ঢেলে তাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে। জ্বলন্ত অর্ককে যাতে কেউ সাহায্য করতে না পারে সেজন্য কিছু মুসলমান লাঠি হাতে প্রহরারত ছিল। পরে অবশ্য এক রিক্সাভ্যান চালকের সহায়তায় জীবন্মৃত অর্ককে হাসপাতালে ভর্তি করা সম্ভব হয়। এই নৃশংস ঘটনাও বিষাদমগ্ন করতে পারেনি মমতাজ বানু এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের।

আরও আছে। মালদার পাইকপাড়া গ্রামের মুসলিম কন্যা হোসেনারার সঙ্গে জামতলা গ্রামের সুজল মন্ডলের দীর্ঘদিনের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতাও ছিল। এরা সাবালক এবং সহমতের ভিত্তিতেই বিবাহ করে। সুজল মন্ডলের পরিণতি শৈলেন্দ্র প্রসাদের মতো মর্মান্তিক না হলেও গ্রামের মোল্লা মাতব্বররা হোসেনারার পরিবারকে একঘরে করে এবং তাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল, মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া অঞ্চলের মহিষমারা গ্রামে। ওই গ্রামের ১৯ বছরের রেবেনারা খাতুনের ঘনিষ্ঠতা হয় ওই গ্রামেরই পুলিশ ক্যাম্পের কনেষ্টবল সুরজিত তেওয়ারীর সঙ্গে। ঘনিষ্ঠতা সূত্রে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। রেবেনারার পিতা আরেজুল মন্ডল এবং তার পরিবার সেই বিবাহ মেনে নিলেও মেনে নিল না ওই গ্রামের মৌলানা মোল্লার দল। তারা ফতোয়া জারি করল সুরজিতকে মুসলমান হতে হবে। কিন্তু এতে সুরজিত রাজী নয়। ফলে আরেজুল মন্ডলের পরিবারকে একঘরে করা হল। তাদের ধোপা নাপিত বন্ধ করা হল। মুনিষ মজুর, চাষ আবাদ বন্ধ করা হল। তাদের সঙ্গে কেউ কথা বলবে না, তারা কারও জমির ওপর দিয়ে হাঁটতে পারবে না, তাদের সারের দোকান, গম ভাঙ্গানোর দোকানে কেউ যেতে পারবে না। বাধ্য হয়ে আরেজুল মন্ডল পরিবার পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হল। কিন্তু সেখানেও কোনও প্রতিকার না পেয়ে গ্রামছাড়া হতে হয়েছিল ওই আরেজুল মন্ডল

জনমত

পরিবারকে। সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল ৯৯ সালের ২৯ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায়। মানবতাবাদীরা যথারীতি নির্বিকার, মৌনীবাবা। আবার গত ৮ আগস্ট আনন্দবাজার পত্রিকায় আর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। পাটনার রাহুল কুমার বিবাহ করেছিল রাঁচীর রুকসানাকে। কিন্তু ভিন্ন সম্প্রদায়ের এই বিবাহে সমাজের স্বীকৃতি না থাকাতে পাটনার এক হোটেলে আত্মঘাতী হয় এই নবদম্পতি। ওই ৮ আগস্টই মুম্বই-এর নাগ পাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ মুন্না খান নিজের অষ্টাদশী কন্যা মেহনাজকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে যেহেতু সে পাড়ারই এক হিন্দু ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছিল। এই খুনের ব্যাপারে পিতা মহম্মদ মুন্না খানকে সাহায্য করেছিল মুন্না খানের বিবি শেহনাজ খান এবং তাদের ছোট মেয়ে ১৪ বছরের গুলনাজ। হত্যার পর মেহনাজের দেহ ১১টি টুকরো করে দুটি বস্তায় বেঁধে বায়কুল্লা উড়াল পুলের নীচে ফেলে দিয়ে আসে। আরও আছে। বছর চারেক আগে উত্তরপ্রদেশের গড়মুক্তেশ্বরের মুসলিম কন্যা গুলিস্তা বাপ-মা'র মতকে অগ্রাহ্য করে নিজের ধর্ম বদলে হিন্দু হয় এবং বিয়ে করে অঙ্কেশ্বর উপাধ্যায়কে। কিন্তু গুলিস্তার বাবা মা এই বিয়ে অগ্রাহ্য করে এবং তারা গুলিস্তা এবং অঙ্কেশ্বরকে খুনের হুমকি দেয়। প্রাণভয়ে গুলিস্তা আদালতে আর্জি জানায় এবং স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চায়। এ ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। শান্তিপুরের লিয়াকৎ আলি তার কন্যাকে বিয়ে করার অপরাধে চঞ্চল সাধুখাঁকে না ধরতে পেরে চঞ্চলের ৬০ বছরের বৃদ্ধ পিতা রবিনাথ সাধুখাঁকে খুন করেছিল লিয়াকৎ আলি আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা।

দেখা যাচ্ছে হিন্দু কন্যা মুসলিম সমাজে সাদরে গৃহীত হলেও একটিও মুসলিম মেয়েকে সমাজ থেকে বেরিয়ে যেতে দেয় না মুসলিমরা। এজন্য কোনও বিকার নেই। বিরূপতা নেই তথাকথিত মানবতাবাদী রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিজীবীদের। তাদের যত বিলাপ, যত হাহাকার প্রিয়াঙ্কা টোডিকে প্রিয়াঙ্কা রহমান করা যাচ্ছে না এই কারণে। পেট্রোডলারের কি অপার মহিমা! যথোপযুক্ত পেট্রোডলার পেলে এরা হয়ত নিজেদের স্ত্রী কন্যা বা ভগিনীদেরও আরব ধনকুবের তথা মুসলমানদের হাতে তুলে দিতেও দ্বিধা করবে না। মমতাজ বানুরও যত গা ঘেঁষাঘেষি ওই সৈয়দ মহম্মদ নূর বরকতির সঙ্গে।

কে জানে তিনিও বা হয়ত ওই দলে ভিড়েছেন। না হলে সিঙ্গুরের ধর্ণামঞ্চে মুসলিম কায়দায় মাথা এবং চুল ঢেকে নামাজ আদায় করেন কেন? মুসলিম ভোটের লালসা এতই প্রবল?

পরম্পরা

শাক্ত-বৈষ্ণবের মিলনে রচিত নবদ্বীপের রাস

সোমনাথ নন্দী

রাসকে বলা হয় রস উৎসব। দর্শনের দৃষ্টিতে যিনি সর্বরসের আকর, যিনি সচ্চিদানন্দ, তাঁর রসমাধুরীতে দেখা যায় সৎ, চিৎ, আনন্দ — এই রস ত্রয়ীর অপার্থিব স্ফুরণ। তাই শ্রুতিতে বলা হয়েছে তাঁকে — 'রস বসৈ সঃ।'

ভক্তিশাস্ত্রের প্রাধান্য আনন্দরসে। সৎ, চিৎ সেখানে পরোক্ষ বিষয়। তদনুসারে পরমানন্দময় পরমেশ্বর আপন রসস্ফূর্তির আস্বাদনে যখন জীবাত্মার মধ্যে রসপ্লাবন সঞ্চার করেন, তখন ঘটে রাসলীলা। রাসলীলায় সর্বোতভাবে দৃষ্ট হয় মধুর রসের প্রভাব। মথুরাধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেদিন প্রকট করেছিলেন অনাস্বাদিত মাধুর্যরসের পরাকাষ্ঠাকে প্রেমাভক্তিদ্রবিত গোপীদের রাগানুরাগা ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে। উল্লেখ্য, শ্রীভগবানের লীলাতনুর বয়স তখন আট।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখা যায়, রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলার অবতারণা শারদ পূর্ণিমা তথা আশ্বিনী পূর্ণিমায় (ভাগবত ২৯/১)। সে রাসলীলা ছিল দেবদুর্লভ, ঋষিবাঞ্ছিত, নয়নমনোহর। রাসস্থলীতে শত শত গোপিনী সত্তাবিলোপী অবস্থায় রাসেশ্বরকে ঘিরে রাসক্রীড়ায় মত্ত। রাসলীলার সেই অপরূপ দৃশ্য দেখে প্রলোভিত দেবাদিদেব মহাদেব। গোপীবেশে তিনি প্রবেশ করলেন রাসমণ্ডলে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। চিনতে পারলেন রাসবিহারী, চিনলেন গোপিনীগণ। বাধ্য হলেন শিব রাসমণ্ডল ত্যাগে। কারণ, সেখানে পুরুষ একমাত্র শ্রীগোবিন্দ। অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

বাংলায় রাস উৎসবের সূচনা কার্তিকী পূর্ণিমায়। পথিকৃৎ শ্রীচৈতন্য পরিকর অদ্বৈত প্রভু। নবদ্বীপে তিনি প্রথম শুরু করেন উক্ত উৎসব আপন উপাস্য বিগ্রহ মদনগোপালকে ঘিরে। সে উৎসব ছিল বাহুল্যবর্জিত, আড়ম্বরহীন। হত পারিবারিক চৌহদ্দির মধ্যে। পরে অদ্বৈত প্রভুর পৌত্র মথুরেশ গোস্বামীর উৎসাহে এই রাস পার্বণ উৎসবের আকার নেয় ষোড়শ শতকের শেষে। পরবর্তীকালে তার ব্যাপ্তি বাড়ে অদ্বৈত প্রভুর আবাসভূমি শান্তিপুরে।

রাস মূলত বৈষ্ণব উৎসব। রাস উপলক্ষে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জমায়েত ঘটত শান্তিপুরে। বলা যায়, তাঁদের বার্ষিক মিলন মেলা। সেখানে হতো বৈষ্ণব দর্শন, বিশেষত গৌড়ীয় দর্শন বিষয়ক আলোচনা ও সাধনধারা কেন্দ্রিক চর্চা। পরবর্তী পর্যায়ে সাধারণ মানুষের যোগদানে হয়ে ওঠে সার্বজনীন।

শান্তিপুরের রাসের খ্যাতি যদিও দেশব্যাপী, নবদ্বীপের রাস কিন্তু কোনও অংশে কম নয়। শান্তিপুরের রাস সর্বোতভাবে বৈষ্ণবকেন্দ্রিক। নবদ্বীপের রাস বিপরীতে শাক্ত বৈষ্ণবের মিলনকে ঘিরে। নবদ্বীপের রাসকে শাক্ত রাস বলে অভিহিত করা হলেও উক্ত রাসের অন্য অভিধা হল পটপূর্ণিমা।

পটপূর্ণিমার অর্থে এবার আসা যাক। নবদ্বীপের বৈষ্ণব রাসে গরুর গাড়ির চাকার মতো একটি বড় চাকা তৈরি করা হত। চাকার কেন্দ্রস্থলে থাকত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। চাকাকে বসানো হতো কুমোরদের চাকার মতো একটি দণ্ডে। চাকার চারপাশে থাকত অষ্টসখীর মৃণ্ময় ছোট ছোট মূর্তি।

মাঝে মাঝে সেই চক্রকে ঘোরানো হত। বলা হত, চক্ররাস বা চাকরাস। পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক পট দিয়ে সাজানো হত মণ্ডপ। সেই থেকে লোকমুখে উক্ত রাসপর্ব পটপূর্ণিমা হিসাবে খ্যাত হয়।

এই উৎসবের আসল উদ্যোক্তা কে তার সঠিক বিবরণ অমিল। কারও মতে, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, কেউ বলেন, তাঁর উত্তরপুরুষ গিরিশচন্দ্র রাসের উদ্ভাবক। তবে এ রাস যে শ্রীচৈতন্যের পরবর্তীকালে, তা নিয়ে পণ্ডিতরা একমত। নবদ্বীপে রাসের উৎপত্তি বিষয়ে আরও একটি জনশ্রুতি পাওয়া যায়। তা হল, ঢাকা থেকে নৌকাযোগে নবদ্বীপ পাড়ি দিয়েছিলেন ভৃগুরাম সপরিবারে। পথিমধ্যে নৌকাডুবিতে মারা যান তাঁর স্ত্রী-পুত্র। নবদ্বীপে কোনওক্রমে পৌঁছে তিনি দিয়ারাপাড়ায় বসবাস করতে থাকেন। শুরু করেন সেখানে তন্ত্রসাধনা। কিন্তু সে স্থান ঘন ঘন বন্যা কবলিত হওয়ায় তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আনুকূল্যে তেঘরিপাড়ায় একখণ্ড জমি দান হিসাবে পান। সেখানে পঞ্চ মুণ্ডি আসন স্থাপন করে তন্ত্র সাধনা করতে থাকেন।

অন্যদিকে দিয়ারাপাড়ায় স্থানীয় মানুষজন ভৃগুরামের সাধনবেদীতে অর্ঘ দিতে শুরু করেন। পরে সেখানে রাসপূর্ণিমার দিন অলকনাথ শিব ও কালীমন্দির স্থাপন করেন কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত শঙ্করনাথ তর্কবাগীশ। পরবর্তীকালে উচ্চারণ অপভ্রংশে তাদের জনপরিচিতি দাঁড়ায় এখানে শিব ও কালী নামে। মনে হয় নবদ্বীপ রাসের এটিই প্রথম মূর্তি। তার ৫৭ বছর পরে ব্যাদরাপাড়ায় (বন্দরপাড়া) ও আমপুলিয়া পাড়ায় শুরু হয় শবশিবা আরাধনা। তাকেই ধরা যেতে পারে নবদ্বীপ রাসের সূচনা — ১৭৫২-১৭৫৫ সালের মধ্যে।

নবদ্বীপের রাসে দেখা যায় প্রতিমা বৈচিত্র্য যা বাংলার যে কোনও উৎসবে বিরল। ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৪০০ দেবদেবী পূজিত হন। বিভিন্ন কালীমূর্তির মধ্যে আছে ভদ্রকালী, শ্যামাকালী, নৃত্যকালী, রণকালী, মুক্তকেশী, কৃষ্ণকালী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি। দুর্গা মূর্তিতে দেখা যায় বিন্ধ্যবাসিনী, মহিষমর্দিনী, গণেশজননী, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি রূপ বিগ্রহ।

শাক্তরাসে এখানে প্রাধান্য থাকলেও বৈষ্ণবরাস কোনও অংশে কম যায় না। শ্রীবাস অঙ্গনের নিকটে সমাজবাড়ি, রাসলীলা মাঠ, পোড়ামাতলার হরিসভা, বড় আখাড়া ও নতুন আখাড়ায় রাস উৎসব রীতিমতো দর্শনীয় হয়ে ওঠে।

রাস সমাপ্ত হয় পরদিন অর্থাৎ কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিতে। সেদিনই সব প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় মহাসমারোহে। তাকে বলা হয় ভাঙারাস। ব্যতিক্রম অবশ্য শান্তিপুর। তাদের ভাঙা রাসের ব্যাপ্তি তারপরের দিন (কৃষ্ণা দ্বিতীয়া) সারারাত ধরে। অভিজ্ঞতা হল, নবদ্বীপের ভাঙারাস শেষ করে দর্শনার্থীরা চলে আসেন শান্তিপুরে। বর্তমানে নবদ্বীপের রাসে বৈষ্ণব অংশীদারিত্ব হ্রাসের পথে। ভাটা পড়েছে আবেগে। সে জায়গায় দখল নিয়েছে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবর্তিত সার্বজনীন শাক্তরাস। যার প্রাণবন্ততা অব্যাহত।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে স্ত্রীরোগ চিকিৎসা

রবীন সেনগুপ্ত

স্ত্রী দেহের অভ্যন্তরে ও বহিঃদেশে বিশেষ প্রাকৃতিক কারণে ঈশ্বর কিছু আলাদা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃজন করেছেন। এই বিশেষ স্ত্রী অঙ্গ গুলিতে ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিলে তার জন্য যে সকল বিশেষ ঔষধের প্রয়োজন হয় সেগুলির যথাবিধি প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়কেই স্ত্রীরোগ চিকিৎসা নামে অভিহিত করা হয়। ইংরাজী ভাষায় এই বিষয়টিকে 'গাইনোকলজি' বলা হয়।

বিশেষ স্ত্রী ব্যাধির মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল গর্ভধারণ যন্ত্রণা, প্রসব বেদনা, জরায়ু কিম্বা প্রসব নালীতে ক্ষত, অনিয়মিত রক্তস্রাব, বক্ষদেশের সৌন্দর্য হ্রাস ইত্যাদি।

যেটিকে বর্তমানে ইংরাজীতে ওভারি বলা হয়, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সেটিকে মাতৃগ্রন্থি নামে চিহ্নিত করা হয়। ইংরাজীতে যেটিকে ইউটেরাস বলে সংস্কৃত ভাষায় সেটির নাম জরায়ু। ইংরাজী টার্মিনোলজীতে যেটি বার্থোলিন্‌স্ গ্ল্যান্ড, বৈদিক সাহিত্যে তাকেই বলে রতিগ্রন্থি।

নির্দিষ্ট সময় অন্তর বয়ঃপ্রাপ্ত নারীদের ক্ষেত্রে যে স্ত্রীরস নিঃসৃত হয় ইংরেজীতে সেটিকে মেনট্রুয়েসান সাইকেল বলে হিন্দু শাস্ত্রে সেটিকেই রজঃচক্র নামে অভিহিত করা হয়েছে।

মাতৃঅঙ্গ থেকে যছি রজঃচক্র সমাপন হয়ে যাওয়ার পরও স্রাব হয় তখন তাকে প্রদর রোগ নামে অভিহিত করা হয়। এই স্রাব যদি ঈষৎ হলুদ, কালো বা লাল বর্ণের হয়, তাকে পৈতিক প্রদর, ফেনিল বা মাংসধোয়া জলের মতো স্রাব হলে তাকে বাতজ প্রদর, ঈষৎ পান্ডু বা সাদা স্রাবকে শ্লৈষ্মিক প্রদর বা শ্বেত প্রদর বলে। গর্ভপ্রপাতাদতি মৈথুনাচ্চ অর্থাৎ গর্ভপাতের ফলে বস্তিপ্রদেশের স্নায়ু ও গ্রন্থি দুর্বল হয়ে সাধারণত প্রদর রোগ সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত সহবাস ও মৈথুন থেকে মেয়েদের এই রোগ সৃষ্টি হতে পারে। সূর্যমনির মূল ও গোল মরীচ দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ প্রদর রোগ নাশে সহায়তা করে থাকে। কৃকলাস ও সর্পের রক্ত সহযোগে পায়রার পিত্ত ও তন্ডুলজল সহযোগেও প্রদর রোগের ঔষধ নির্মাণ করা

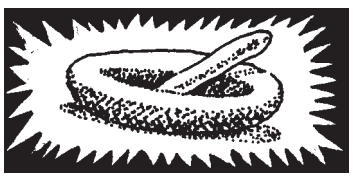

নিরাময়

সম্ভব।

গর্ভবতী নারীদের বেদনা নাশ করার জন্য একটি সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে — কুশ কাশো রুবুকানাং মূলৈর্গোক্ষুরকস্য চ। শূতং দুগ্ধং সিতাযুক্তং গর্ভিন্যাং শূলন্যু পরম্। অর্থাৎ কুশ, কাশ, এরন্ড ও গোক্ষুর -এর মূলের সাথে দুগ্ধ পাক করে শর্করা সহযোগে সেবন করলে গর্ভীনির শূল নাশ পায়।

সুপ্রসবের জন্য অপামার্গের মূল ব্যবহার করার বিধি প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রগুলির নানা শাখায় রয়েছে। আকনদি, লাঙ্গলিয়া, অপামার্গ কূটজের মূল পৃথকভাবে পেষন করে প্রস্তুত ঔষধের কথাও প্রসব যন্ত্রণা নিবারণ সংক্রান্ত অংশে পাওয়া যায়।

বারবার সন্তান জন্মেও মারা যাচ্ছে এই জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের যে অংশে আলোচনা করা হয় তার নাম মৃতবৎসা চিকিৎসা। মৃতবৎসাদের অনেকানেক চিকিৎসার মধ্যে একটি হল — প্রাঙমুখোঃ কৃত্তিকাঋক্ষে বন্ধ্যা কর্কোটকীং হরেৎ। তৎকন্দং পেষয়ে ত্তোথৈঃ কর্ষমাত্রং সদা পিবেৎ। এই ফর্ম্মূলাটিতে পীতঘোষলতার মূলকে জলের সাথে পেষণ করে ঔষধ প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে।

যে নারীর একটি সন্তান হয়ে আর গর্ভ হয় না আয়ুর্বেদে তাকে কাকবন্ধ্যা নারী বলা হয়। এই কাকবন্ধ্যাত্ব দূরীকরণের জন্য শাস্ত্র বলছে অশ্বগন্ধীয়মূলতু গ্রাহয়েৎ পুষ্যভাস্করে। পেষয়েন্ম হিযীক্ষীরৈ পলার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা। সপ্তাহাল্লভতে গর্ভং কাকবন্ধ্যা চিরায়ুষম্ — এক্ষেত্রে অশ্বগন্ধার মূল সংগ্রহ করে তাকে মোষের দুধে পেষণ করে এক পল পরিমাণে এক সপ্তাহ ব্যাপী ভক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুরুষের বীর্যে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণে শুক্রানু না থাকে তাহলে নারীর সন্তান ধারণ সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে পুরুষের চিকিৎসা প্রয়োজন। কিন্তু নারীর দেহেও নানা কারণে বন্ধ্যাত্ব ব্যাধি বাসা বাঁধতে পারে। ভিটামিন ই-এর অভাবে হোক, জরায়ুর অপরিণত ভাবের জন্য হোক, অতিরিক্ত চর্বির কারণে হোক বহু নারীকেই বন্ধ্যাত্ব এসে গ্রাস করে, তাই এর চিকিৎসা পদ্ধতিও দু-চার কথায় বলা সম্ভব নয়। তবু সংক্ষিপ্ত আলোচনা যুক্ত এই প্রবন্ধটির জন্য বন্ধ্যাত্বদূরীকরণের সাধারণ একটি আয়ুর্বেদিক সূত্র দেওয়া হচ্ছে। সূত্রটি এইরূপ — কৃষ্ণাপরাজিতা-মূলং ছাগীক্ষীরেণ সংপিবেৎ। ঋতুকালে সমায়াতে ভুক্ত্বা গর্ভধরা ভবেৎ।

এই সূত্র অনুসারে কৃষ্ণ অপরাজিতার মূল ছাগীদুগ্ধের সাথে পেষণ করে ঋতুকালে সেবন করলে বন্ধ্যা নারী গর্ভবতী হয়। দ্বিতীয় সূত্রটিতে বলা হচ্ছে যে গোক্ষুরবীজ নিসিন্দার রসে পেষণ করে তিন অথবা সপ্তরাপত্র পান করলে নারীর বন্ধ্যাত্বকরণ দূরীভূত হতে পারে।

যেসব নারীর গর্ভস্রাব হয়, যারা কেবল কন্যাসন্তান প্রসব করে, যাদের সন্তান অল্পায়ু হয়, তাদের সকলের জন্য ফলঘৃত নামে এক প্রকার ঘৃত সে যুগের শাস্ত্রকারগণ গ্রহণ করার জন্য প্রদান করতেন। অত্যন্ত ফলপ্রদায়ী এই ঘৃতরূপ ঔষধটি নির্মাণের উপাদানের সংখ্যা প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। ফলতঃ এর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রবাদি সংগ্রহ ও নির্মাণ সহজ সাধ্য কাজ নয়। এটির উপাদান ও পদ্ধতি হিসাবে বলা হয়েছে — মঞ্জিষ্ঠা, যষ্ঠীমধু, কুড়, হরিতকি, আমলকী, বহেড়া, শর্করা, বেড়েলা, মেদা, ক্ষীরযুক্তভূমি কুষ্মান্ড, কাকোলী, অশ্বগন্ধামূল, যমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিঙ্গুল, কটকী, নীলোৎপল, কুমুদ, জক্ষা, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন — প্রতিটি ২তোলা পরিমাণে নিয়ে ৪ সের ঘৃতের সঙ্গে পাক করতে হবে। পাককালে শতমূলীর রস ১৬ সের ও দুগ্ধ ১৬ সের মিশ্রিত করতে হবে। এই ঔষধ নির্মাণের জন্য শুক্ল বর্ণা গাভীর ঘৃত ও অরণ্যস্থ শুক্ল গোময়ের দ্বারা সৃষ্ট অগ্নি ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া আছে।

নারীর বক্ষস্থলের গঠন নষ্ট হয়ে গেলে তাকে পুনরুদ্ধারের জন্য গাম্ভারীরস ও কল্কের সাথে তিলতেল পাক করে নির্মিত রাসায়নিক পদার্থটি তুলা দ্বারা বক্ষে লেপন করার নির্দেশ আর্য়ুবেদ শাস্ত্রে দেওয়া আছে।

বচ ও দাড়িম্ব পেষন করে তার সাথে

(এরপর ১২ পাতায়)

আদর্শ রত্ন

বোধকথা

সতীনাথ রায়

মহর্ষি কপিল মুনি যে রাস্তায় নদীতে স্নানের জন্য যেতেন তার পাশেই কম বয়সী এক বিধবা মহিলার ছোটো কুটীর ছিল। মহর্ষি প্রতিদিনই দেখতেন ওই মহিলাটি কোনও না কোনও কাজে ব্যস্ত। অবশ্য মহর্ষি যে ক'দিন আশ্রমে থাকতেন শুধুমাত্র, সেই দিনগুলিতেই নদীতে স্নানের জন্য তিনি ওই রাস্তায় যাতায়াত করতেন। তবে কোনওবারই তিনি ওই বিধবা মহিলার ব্যস্ত থাকার ব্যতিক্রম হতে দেখেননি। মহর্ষি মহিলার ওইভাবে কাজে ব্যস্ত থাকা দেখে খুব অবাক হতেন। মনে মনে ভাবতেন কাউকে জিজ্ঞেস করি ওই বিধবার পরিচয় কী, কেন তিনি এত পরিশ্রম করেন। কিন্তু মহর্ষির সময়ের অভাবে তা আর হয়ে ওঠেনি। রোজই ভাবতেন একটু খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার।

এরই মাঝে বিশেষ প্রয়োজনে বেশ কয়েকদিনের জন্য কপিল মুনি আশ্রমের বাইরে চলে যান। দীর্ঘ এক মাস পর একদিন সন্ধ্যায় তিনি আশ্রমে ফিরলেন। পরের দিন ভোরে নদীর পথে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছেন, ওই বিধবার নিশ্চয় এতদিনে সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন আর হয়ত তাকে দেখতেও পাওয়া যাবে না। কিন্তু মহর্ষি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেখলেন, তিনি সেই আগের মতোই তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কোনও কিছুরই পরিবর্তন হয়নি। বিস্ময়ের পাশাপাশি মহর্ষির কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। তিনি ঠিক করলেন — স্নানের শেষে বিধবার খবরা-খবর নিয়েই আশ্রমে ফিরবেন। স্নান সেরে ওই মহিলার পরিচয় জানতে পথচারী এক ভদ্রলোককে মহর্ষি জিজ্ঞেস করলেন, মহাশয় আপনি কী ওনার পরিচয় জানেন? ভদ্রলোকটি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন না, তাঁর আত্মীয় বাড়ির যাওয়ার জন্য ভোর ভোরই ওই পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন।

কপিল মুনি আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে নিজেই তখন বিধবার কাছে গেলেন। তিনি তখন খুব মন দিয়ে কিছু একটা করছিলেন। মহর্ষির গলার আওয়াজে তাঁর চমক ভাঙল। মহর্ষিকে দেখা মাত্রই গলায় কাপড় জড়িয়ে প্রণাম করলেন। তিনি মহর্ষিকে কিছু বলতে না দিয়েই তাঁকে ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটা খুব একটা বড় ছিল না। মহর্ষিকে একটি আসনে বসতে দিয়ে তিনি তাঁর আসার কারণ জানতে চাইলে কপিল মুনি বললেন, আপনার এত পরিশ্রম করতে কষ্ট হয় না।

মহর্ষির প্রশ্নে বিধবা মহিলাটি একটু হেসে বললেন, নিজের সংসারের কাজে কষ্ট হবে কেন?

মহর্ষি — কষ্ট না হয়, হয় না, কিন্তু আপনার যদি আর্থিক কষ্ট থাকে তবে আমাকে বলুন। রাজদরবার থেকে আপনার জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করে দিই।

মহর্ষির প্রস্তাবে তিনি কোনও রকম উৎসাহ না দেখিয়ে বললেন, না তার আর দরকার হবে না। আমার কোনও অভাব নেই। মহর্ষি অবাক হলেন। মনে মনে ভাবলেন যে ভোর থেকে কাজে ব্যস্ত থাকেন তার তো অভাব থাকাই স্বাভাবিক। এবার মহর্ষি তাঁর কাছ থেকে অভাব না থাকার কারণ জানতে চাইলে বিধবা তাঁর হাতের কাজটা সেরে নিয়ে বললেন, আমার কাছে তিনটি রত্ন আছে। রত্ন থাকলে অভাব হবে কেন? মহর্ষির রত্নের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে সেগুলি দেখতে চাইলেন। বিধবা মহিলা দ্বিধা না করে একটা ডাক দিলেন। ডাক শুনে তার তিন পুত্র সন্তান ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারা তাদের মা ও কপিল মুনিকে প্রণাম করে পাঠ্যবই নিয়ে বিদ্যালয়ে রওনা হল। যাবার সময় মার গলা জড়িয়ে ধরে বলল— মা, আমাদের গৃহ- পাঠ্য তৈরি হয়ে গেছে। পন্ডিত মহাশয়ের কথা মতো আমরা সব কাজ সেরে ফেলেছি। কপিল মুনি তার সন্তানদের চরিত্র ও নৈতিকবোধ দেখে অভিভূত হলেন। মনে মনে বুঝলেন, যার বিদ্বান চরিত্রবান ও গুণবান সন্তান আছে, তার আর অন্য কী রত্ন প্রয়োজন। আদর্শ সন্তানই পিতা-মাতার কাছে বড় ধন। মহর্ষির মনের সংশয় কেটে গেল। তিনি এবার আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

চিত্রকথা ।। ভক্ত ও ভগবান ।। একুশ

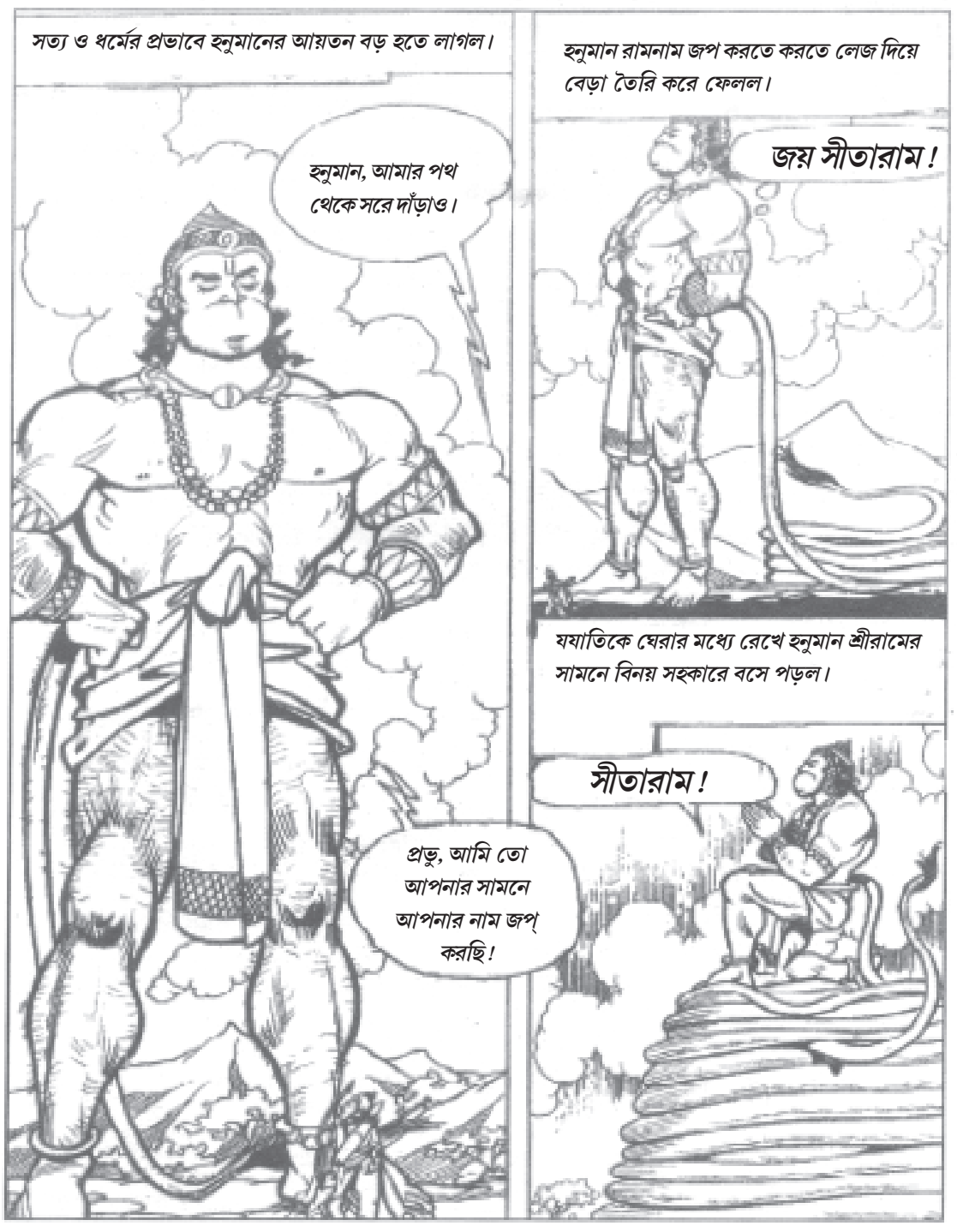

জীবনে বিজ্ঞান

নীল গোলাপ

নামে কী যায় আসে! তবে নামে না হলেও রঙে অবশ্যই যায় আসে। বাড়িতে সাজিয়ে রাখা গোলাপটিকে যদি নিজের পছন্দের রঙে রাঙানো যেত! এসব ভেবেই বোধহয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা ছোট্ট জাদু দেখিয়ে বিজ্ঞানীরা তৈরি করে ফেলেছেন নীল রঙের গোলাপ ফুল। নীল বা নীলাভ রঙের গোলাপ সম্ভব কিনা ভেবেছিলেন কবেই আমাদের কবি বিনয় মজুমদার। জাপানের সানতোরির জিন গবেষকদের তৈরি জেনেটিক্যালি মডিফায়েড নীল গোলাপ পৃথিবীতে এই প্রথম। ভবিষ্যতে হরেক রঙের গোলাপ বিজ্ঞানীরা তৈরি করবেন ওসাকার বিশ্ব গোলাপ কনভেনশনে একথা প্রকাশ করা হয়েছে।

জীবনের উৎস সন্ধানে

পৃথিবীর ভেতরে কী আছে জানার অসীম কৌতূহল নিয়ে ৫ হাজার মিটার গভীর কুয়ো খুঁড়ছেন চীনের ভূতাত্ত্বিকেরা। এশিয়াতে এ ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম। এই গভীর কুয়ো কাজ করবে টেলিস্কোপের মতো। মহাদেশীয় ভূস্তর, আগ্নেয়গিরির রহস্য, জীবনের উৎস, ইত্যাকার নানা বিষয়ে এই কুয়ো তথ্য জোগাবে বলে ভূতাত্ত্বিকদের বিশ্বাস।

কাচের হাড়

শিগ্‌গিরিই পুরনো হয়ে যাবে হাড় প্রতিস্থাপন। লন্ডন ইম্পিরিয়াল কলেজের গবেষকেরা হাড়ের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারে এমন এক ধরনের কাচ আবিস্কার করেছেন। তাঁদের দাবি, এই কাচ শরীরের মধ্যে আয়নিত ক্যালসিয়াম, সিলিকন রেখে মিলিয়ে যায়। এবং হাড়ের কোষের অন্তর্গত জিনকে চাগিয়ে তোলে।

বাঁচাবে হাঙর

ম্যালেরিয়ার মতো মারণ রোগের কবল থেকে মানুষকে বাঁচাতে হাঙরের শরীর থেকে একগুচ্ছ অ্যান্টিবডি তৈরির দাবি করেছেন অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা। গবেষণাগারে হাঙরের জিনে বিশেষ ধরনের প্রোটিন প্রবেশ করিয়ে ওই অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে। লা ট্রোব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সেগুলি মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। তবে ওই অ্যান্টিবডি এখনও কিছুটা পরীক্ষা স্তরে রয়েছে।

চায়ের গুণ

স্কটল্যান্ডের ডান্ডি ইউনিভার্সিটির বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, কালো চায়ের থিয়েফ্ল্যাভিন ও থিয়েরুবিনিন্‌স ফক্সোস জাতীয় রাসায়নিক উপাদান এক ধরনের প্রোটিনের ওপর ইনসুলিনের মতো কাজ করে। কালো চায়ের এই গুণ ধরা পড়লেও রোগ নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা এখনও গবেষণার পর্যায়ে। তাই এখনই অতিরিক্ত কালো চা খেতে বলছেন না তাঁরা।

সুগন্ধি ব্যবহারে বন্ধ্যাত্ব

পারফিউম বা সুগন্ধিতে প্রচুর পরিমাণে ফ্‌থালেট জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ফলে মহিলাদের বন্ধ্যাত্ব হবার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন সুইডেনের এনালাইসেন গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা। এসব সুগন্ধি পণ্যে ক্যালভিন ক্লেন-এর এটার্নিটি ও ল্যানকোম-এর ট্রেসোর নামক বিষাক্ত রাসায়নিক মূলত এর জন্য দায়ী বলে তাঁরা মনে করেন। গন্ধ দীর্ঘক্ষণ থাকার জন্য এই বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় এগুলি রক্তের সঙ্গে মিশে বন্ধ্যাত্বের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়।

— *নির্মল কর*

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে স্ত্রীরোগ চিকিৎসা

(১১ পাতার পর)

সর্ষপ তেল পাক করে তা বক্ষে লেপন করলেও বক্ষস্থল সুশ্রী ও সুগঠিত হয় — এমন তথ্যও শাস্ত্রে রয়েছে।

স্তনে দুগ্ধ কম সৃষ্টি হলে তা বৃদ্ধি করার উপায় হিসাবে ভুঁই কুমড়ার মূলকে দুধের সাথে বেঁটে গ্রহণ করার নির্দেশ শাস্ত্রকারগণ প্রদান করে গেছেন। গর্ভসঞ্চার ছাড়া ঋতুবন্ধ হয়ে গেলে ওড়ের ফুল কাঁজী সহ সিদ্ধ করে গ্রহণ করার নির্দেশও প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত স্ত্রীরোগেরই অ্যালোপ্যাথি ওষুধ রয়েছে। কিন্তু তার সাথে এই সকল কবিরাজী ব্যবস্থাও এখনও নানাভাবেই বহাল রয়েছে। ভবিষ্যতে স্ত্রীরোগ সহ সমস্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রেই আয়ুর্বেদের ব্যবহার বৃদ্ধির নানা লক্ষণও সামাজিক সমীক্ষার মাধ্যমে আমাদের নজরে আসছে।

বত্রিশ বছরের বামফ্রন্ট শাসনে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার হাল-হকিকৎ

মণীন্দ্র নাথ সাহা

সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছোট্ট একটা খবর, যা অধিকাংশ সংবাদপত্র পাঠকের নজরে এলেও মনে স্থান পায়নি। যেহেতু দীর্ঘদিন শিক্ষকতায় যুক্ত ছিলাম সেই হেতু খবরটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই এই প্রবন্ধের অবতারনা। খবরটি হ'ল "সেট"-এ গণিত ও ভূতত্ত্বে সবাই ফেল, হাজার অধ্যাপক পদে যোগ্য ৩০৫"।

প্রতি বছর কলেজের অধ্যাপক নির্বাচনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন (সি এস সি) প্রথমে একটি লিখিত পরীক্ষা নেয়। সেই পরীক্ষার নাম "ষ্টেট এলিজিবিলিটি টেস্ট" যা সংক্ষেপে সেট নামে পরিচিত। এবারের সেই পরীক্ষায় সি এস সি ২৩টি বিষয়ে ২০ জুলাই পরীক্ষা নিয়েছিল। প্রায় সাড়ে সাত হাজার প্রার্থী এবার পরীক্ষা দেন। এবার পাশের হার ৪.২৭ শতাংশ। ফল প্রকাশের পর দেখা যায় গণিত ও ভূতত্ত্বে কোনও পরীক্ষার্থী পাশ করতে পারেননি। এছাড়া বিজ্ঞান বিভাগের ফিজিক্যাল সায়েন্সে ৭, জীব বিজ্ঞানে ১১ ও রসায়নে ১৬ জন পাশ করেছেন। বাণিজ্যে ১২, ইংরেজিতে ১২, এডুকেশনে ৬, মনস্তত্ত্বে ৩, উর্দুতে মাত্র ১ জন পাশ করেছেন। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পাশ করেছেন ইতিহাসে ৭৮, বাংলায় ৩১ এবং অর্থনীতিতে ২৪ জন। তবে কমিশনের চেয়ারম্যান এই বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে গতবারের তুলনায় এবারে পাশের হার বেড়েছে। গতবারের পাশের হার ছিল ২.৯৮ শতাংশ আর এবারের পাশের হার ৪.২৭ শতাংশ।

কমিশনের এই আত্মতুষ্টির ফানুস ফুটো হয়ে যাবে খবরের কাগজের একটি প্রতিবেদন পাঠ করলে। প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ ঃ

"বর্তমান উচ্চশিক্ষা চলছে তিনভাবে ঃ —

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে নিয়মিত ছাত্রভর্তির মাধ্যমে, (২) দূরাগত শিক্ষার মাধ্যমে, (৩) মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে। প্রথমটি "ট্রাডিশনাল" শিক্ষাব্যবস্থা যার মাধ্যমে পুরাতন নিয়মে ছাত্র-ছাত্রীরা এম এ, এম এস সি পাশ করে। শেষ দুটি হল নবীন ব্যবস্থা। যার মূল কথা হল অর্থ সংগ্রহ, শিক্ষা গৌণ। দূরাগত শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এখানে আয় বেশি, ব্যয় কম, শিক্ষা আরও কম। বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী কোনও রকমে একটা এম এ বা এম এস সি ডিগ্রি অর্জন করতে ব্যকুল। আমাদের চিন্তা বা কমিশনের চিন্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে রেগুলার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। কেন তারা এমন ফল করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তো তারা উজ্জ্বল মার্কশীট পাচ্ছে।

রোগটা এখানেই। নম্বর পাচ্ছে শিক্ষা হচ্ছে না। শিক্ষা হচ্ছে না বলেই কমিশনের পরীক্ষায় এই দুর্দশা। শিক্ষা হচ্ছে না কেন? অযোগ্য শিক্ষক। অযোগ্য শিক্ষক কেন? সি পি এমের রাজনীতি। সি পি এমের রাজনীতি কেন? নন্দীগ্রামের মতো শিক্ষা জগৎকেও দখল করা। দখল করা কেন? ভোট পাওয়া। ভোট পাওয়া কেন? সি পি এমের রাজত্ব চিরস্থায়ী করা। শিক্ষা হচ্ছে না অথচ উজ্জ্বল মার্কশীট হচ্ছে কী করে? অযোগ্য শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠন এস এফ আই-এর আঁতাতে।"

এবার অধ্যাপকদের কীর্তি শুনুন।

"...একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার বিভাগীয় প্রধান ইংরেজিতে লিখছেন। "I do hereby authorised sri....a non teaching stuff...to recive my cheque."

"... বাংলাদেশ থেকে একজন অধ্যাপক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বক্তৃতা দিতে আসবেন। সেই বিভাগের প্রধান ছাত্র-ছাত্রীদের ও শিক্ষকদের নোটিশ দিয়েছেন — বক্তৃতার বিষয় : 'এপাড় বাংলার ওপাড় বাংলার ছোট গল্প'! ইনিও সম্প্রতি প্রমোশন পেয়ে 'প্রফেসর' হয়েছেন।

আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের নোট দিয়েছেন, 'পয়োমুখম' শব্দের অর্থ নর্দমা। অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান আর এক অবসরপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে চিঠি লিখছেন, 'সম্মানিত/ আশা করি কুশলে আছেন'। এগুলো তো মাত্র খবরে প্রকাশ, ক্লাশরুমে আরও কত কীর্তি যে স্থাপিত হয় কে জানে। এইসব শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হন কী করে? বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথায় আছেন উপাচার্য। সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সি পি এমের লোক, প্রকৃত শিক্ষাবিদ নন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে সিনেট-সিন্ডিকেট বা কোর্ট একজিকিউটিভ কাউন্সিল। এগুলিও সিপিএমের লোকে ভরা। এঁরা দেখেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে কোন শিক্ষক সি পি এমকে ভোট দেবে, আর কে দেবে না। ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য গুণের থেকে বড় হয় পার্টি সংসর্গ। এই সমস্ত শিক্ষক কোনও সুপরামর্শ গ্রহণ করেন না। বিশ্ববিদ্যালয় চলবে কি চলবে না, এঁরা ভাবেন না। শুধু দেখেন পার্টি আর ভোট। এইসব শিক্ষক পদ্মবনে মত্ত হস্তীর মতো লম্ফঝম্ফ করতে থাকেন। পদ্মাসনা সরস্বতী এঁদের দেখে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেছেন। তাই সেট পরীক্ষায় বাংলায় ৯ জন পাশ করেছে, অঙ্কে সবাই ফেল।

আর ভাবার বিষয় যে, একজন জাল ডিগ্রিধারী অধ্যাপক, যিনি সত্য গোপন করে উপাচার্য হয়েছিলেন, তিনি এখনও সিলেকশন কমিটির মেম্বার হচ্ছেন কী করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সততা বা মূল্যবোধ বলে কিছু থাকবে না?"

এতো গেল উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে। একেবারে নীচু স্তর অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার হালটা একবার দেখুন।

সিপিএমের নেতারা সুশিক্ষক চাননি, চেয়েছেন অনুগত পার্টিম্যান, অনুগত উপাচার্য, অনুগত অধ্যক্ষ, অনুগত শিক্ষক।
এক নাগাড়ে বত্রিশ বছর সরকারি মদতে একটি রাজনৈতিক দল খবরদারি চালালে শুধু শিক্ষা নয়, যে কোনও ব্যবস্থাই রসাতলে যেতে বাধ্য।

প্রাথমিক স্তরে কয়েক বছর ধরে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বেসিক ট্রেনিং প্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে পাঠানো নামের তালিকা অনুযায়ী প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়। এখানেও যোগ্যতার মানদন্ডে বিচার করা হয় না, হয় দলীয় আনুগত্য ও আর্থিক মানদন্ডের মাধ্যমে।

বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে সবচেয়ে আগে হাত দেয় রাজ্যের প্রাথমিকে শিক্ষার সংস্কার সাধনে ১৯৭৯ সাল থেকে প্রাথমিকে পাশ-ফেল ও ইংরেজি উঠিয়ে দিয়ে। এর কারণ ছিল প্রাথমিক ড্রপ আউটের সংখ্যা কমবে। কিন্তু ফল হয়েছে উলটো। পাশ-ফেল তুলে দেওয়ায় স্বস্তি পেয়েছে একাধারে ছাত্র অভিভাবক ও শিক্ষক। অর্থাৎ পঠন-পাঠনে ঢিলে-ঢালা ভাব এসেছে। এমন কী স্কুল পরিদর্শণের যে ব্যবস্থা পূর্বে ছিল সব স্তরেই তা প্রায় অকেজো করে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার দায়বদ্ধ তার পরিবেশ কোনও স্তরেই দেখা যাচ্ছে না।

স্কুলছুট শিশুদের শিক্ষার আঙ্গিনায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশে DPEP / সর্বশিক্ষা অভিযান শুরু হয় ২০০০ সালে। এটাও একটা হাস্যকর খেলা। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি গ্রাম সভার অধীনে একটি করে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা। স্কুলছুট ছেলে মেয়েদের সেতু পাঠক্রম হিসেবে অষ্টম মান পর্যন্ত পড়ানো হবে। পড়াবেন গ্রামের অষ্টম শ্রেণী পাশ কোনও এক ৪০ বছর বয়স্কা মহিলা। বেতন ১০০০ টাকা। চুক্তিতে নিয়োগ। পরে অবশ্য শিক্ষিকার ডিগ্রি বাড়িয়ে অষ্টম শ্রেণী পাশের পরিবর্তে মাধ্যমিক পাশ করা হয়েছে। ভাবুন একবার ২০-২৫ বছর আগে পড়াশুনা শেষ করা এবং সংসার জীবনে জড়িয়ে যাওয়া কোনও মহিলার ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের অষ্টম মান বজায় রাখা সম্ভব?

আবার দেখুন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যার নিরিখে শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় চুক্তির ভিত্তিতে পার্শ্ব শিক্ষক (Para Teacher) নিয়োগ প্রথা চালু করা হয়েছে। বেতন ১০০০ টাকা। বর্তমানে তা বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করা হয়েছে। এটাও একটা ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করার কৌশল। নিয়োগ পদ্ধতি কী রকম?

প্রতিটি গ্রাম সংসদে একটি করে গ্রাম শিক্ষা কমিটি (VEC) ও মাতা শিক্ষক সমিতি (MTA) গঠিত আছে। সেই কমিটি থেকে সংসদে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পার্শ্ব শিক্ষক নিয়োগের জন্য পাঁচ জনের একটি নিয়োগ কমিটি গঠিত হবে। এই নিয়োগ কমিটিতে থাকবেন — (১) সংসদের পঞ্চায়েত সদস্য, যিনি পদাধিকার বলে সভাপতি, (২) বিদ্যালয়ের প্রধান। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, পদাধিকার বলে সচিব, (৩) ২ জন গ্রাম শিক্ষা কমিটির (VEC) সদস্য ও (৪) ১জন মাতা শিক্ষক সমিতির (MTA)'র সদস্য। অধিকাংশ VEC এবং MTA'র সদস্য, সদস্যা ও পঞ্চায়েত সদস্য, সদস্যা সপ্তম, অষ্টম শ্রেণী পাশ, কেউ বা নিরক্ষর।

পার্শ্ব শিক্ষকের প্রার্থী হতে পারবেন সংসদ এলাকার মাধ্যমিক পাশ তরুণ-তরুণীরা। এই প্রার্থীদের অনেকেই বেসিক ট্রেনিং প্রাপ্ত, উচ্চ মাধ্যমিক বা বি এ ইত্যাদি ডিগ্রি গোপন করে শুধু মাধ্যমিক পাশ লেখেন। এই সমস্ত প্রার্থীদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ওই সমস্ত সপ্তম, অষ্টম শ্রেণী পাশ বা নিরক্ষর সদস্য-সদস্যরা। ইন্টারভিউ-এর সময় ওই সমস্ত সদস্যরা প্রার্থীদের যে প্রশ্ন করেন তা সচিবের তৈরি করে দেওয়া প্রশ্নপত্র। যদি কোনও প্রার্থী বোঝেন যে তার চাকরী হবে না আর তিনি যদি ইন্টারভিউয়ের সময় কোনও প্রশ্নের উত্তর জানা সত্ত্বেও প্রশ্নকর্তাকে ঘুরিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বলেন যে — "এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। যদি দয়া করে উত্তরটা আপনি বলে দেন তবে ভবিষ্যতে আমি উপকৃত হবো।" তাহলে সেই সদস্যের পোশাক নোংরা হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই যদি ঘটনা হয় তবে কাকে নির্লজ্জ বলা যাবে। নিয়োগ কমিটির সদস্য, শিক্ষা বিভাগ না সরকার?

এমনিতেই অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক নেই। কোনও স্কুলে একজন, কোনও স্কুলে দুইজন, কোনও স্কুলে তিনজন শিক্ষক। চারজন শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ভাগ্যবান বলতে হবে। উপরন্তু প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে জনগণনা, এডুকেশন সার্ভে, ভোটার তালিকার কাজ, ভোট গ্রহণের কাজ, উপরন্তু দৈনন্দিন ছাত্র-ছাত্রীদের মিড-ডে মিল খাওয়ানোর মতো হরেক কিসিমের কর্তব্য পালন করে ছাত্রদের পাঠদান করতে হয়। এভাবে পাঠদান কতটা ফলপ্রসু হতে পারে। পাঠদান যে এভাবে ফলপ্রসু হতে পারে না তা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সকলেই জানেন। তবে এরা ভাবের ঘরে চুরি করতে ওস্তাদ। আর এই কারণেই ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গজিয়ে উঠেছে এবং তা রমরমিয়ে চলছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ প্রধান শিক্ষক বা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা সিপিএমের একনিষ্ঠকর্মী। এঁরা স্কুলে গিয়ে অনেকেই ক্লাস নেন না। কেউ বা দু' একটা ক্লাস নিয়ে সহ শিক্ষকদের স্কুলে রেখে নিজে বেরিয়ে পড়েন হয় পার্টির কাজে, নয় ছুতো করে ব্র. ঢ. অফিসে যায় কাল হরণের জন্য। যারা বেশি উদার তাঁরা দেড়টা বা দুটোর সময় ছুটি ঘোষণা করে সহ শিক্ষকদেরও সুযোগ দেন। বিরোধী দলের সমর্থক শিক্ষকরাও কাজে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেন শাসক দলের শিক্ষক নেতাদের তোয়াজ করে এবং সংগঠনে চাঁদা দিয়ে। তবে আশার কথা ব্যতিক্রমী ও সৎ শিক্ষক এখনও অনেক আছেন। একটানা বত্রিশ বছর এভাবে চলে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা রাজ্যের যতটা পেছনো সম্ভব, পশ্চিমবঙ্গ ততটাই পিছিয়েছে। এক সময় শিক্ষায় এই রাজ্য ভারতের এক নম্বরে ছিল। কলকাতাকে বলা হত ভারতের সাংস্কৃতিকরাজধানী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রেসিডেন্সি কলেজ, যাদবপুর কলেজ ছিল দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আজ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এদের খুঁজতে গেলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার।

২০০৩ সালে অমর্ত্য সেন তাঁর প্রতীচী ট্রাস্টের রিপোর্টে এত কথা না বললেও, শিক্ষায় রাজ্যের অবনতির জন্য রাজনীতিকেই দায়ী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "শিক্ষকরা রাজনীতির সঙ্গে অতি মাত্রায় জড়িয়ে পড়ার জন্যই প্রাথমিক শিক্ষার শোচনীয় হাল হয়েছে।"

যে কথা অমর্ত্য সেন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন, তা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সিপিএমের নেতারা সুশিক্ষক চাননি, চেয়েছেন অনুগত পার্টিম্যান, অনুগত উপাচার্য, অনুগত অধ্যক্ষ, অনুগত শিক্ষক।

এক নাগাড়ে বত্রিশ বছর সরকারি মদতে একটি রাজনৈতিক দল খবরদারি চালালে শুধু শিক্ষা নয়, যে কোনও ব্যবস্থাই রসাতলে যেতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গের সব ক্ষেত্রেই তার লক্ষণ ফুটে উঠেছে।

জলপথের কোনও বিকল্প নেই

(৯ পাতার পর)

ভাগ্যের পরিহাস সত্যকে মানতেই হবে। আমি রাজনৈতিক লোক নই, আমি একজন সাধারণ শ্রমিক।

জলঙ্গী নদীর পুনরুদ্ধারের কাজ হলে কম করে পাঁচ থেকে ছয় বৎসর সময় লাগবে। ঠিকা শ্রমিকরা কাজ পাবে। জলপথ ঠিক থাকলে জাহাজ যাতায়ত করবে, জিনিসপত্র আনানোর খরচ (পরিবহন খরচ) কম পড়বে, সুতরাং জিনিস পত্রের দামও কমবে। ঠিকা শ্রমিক না বলে অস্থায়ী শ্রমিক বলা হলে অন্ততঃপক্ষে ন্যূনতম মজুরী পাবে। ঠিকা প্রথায় গেলে ১১০০, ১২০০, ১৫০০ টাকা পাবে। পরিবারের প্রতিপালন খরচ তো আর কমবে না। অস্থায়ী শ্রমিক না ঠিকা শ্রমিক কোনটা ভাল ভেবে দেখুন। ঠিকা প্রথা ক্রীতদাস প্রথারই আর এক রূপ। ঠিকা প্রথা বন্ধ হোক। আবারও বলছি জল পরিবহনের কোনও বিকল্প নেই। এবং সি আই ডবলিউ টি সি-কে টুকরো টুকরো করার অধিকার বা আইন ভারত সরকারের আছে কিনা!

তাহলে বৃটিশরাই এই সব সম্পত্তি বেচে দিয়ে যেতে পারত কিন্তু তারা তা করেনি। আমাদের দেশের সরকার জলদস্যু ডেকের থেকেও অধম, "ড্রেক" রানী এলিজাবেথকে ধন সম্পত্তি দিয়েছিল, ইংল্যান্ডকে ঋণ মুক্ত করতে। আমাদের দেশের সরকার জিনিসপত্র টুকরো করে বেচে দেবার চেষ্টায় — যা রাষ্ট্র বিরোধী। চিন্তা করে দেখুন আমরা কোন সরকারের দায়-দায়িত্বে আছি। "ড্রেক" জলদস্যু হয়েও একজন দেশপ্রেমিক।

আমাদের স্বপ্নের ভারতবর্ষ, স্বপ্ন ও কল্পনার জল পথ, ঐতিহাসিক সংস্থা ধ্বংস করছে ভারত সরকার। সরকারের কাছে এর জবাব চাইবেন না?

ওরা একটা মানুষ

দীপেন ভাদুড়ী

কোনও একদিন কোনও এক সমাজের মানুষ তার ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যাবে। চিড়িয়াখানায় বাঘ ভালুক দেখতে দেখতে থমকে দাঁড়াবে। ছেলে প্রশ্ন করবে, বাবা ওটা কী? বাবা ছেলের প্রশ্নের জবাবে বলবে, ওটা? আমাদের মতো একটা মানুষ। এরা

জাতিতে হিন্দু। এদের ভাষা ছিল বাংলা। এই জাতটার মধ্যে ছিল বোধ, বুদ্ধি, বিবেক। সব ছিল। ছিল না শুধু সাংগঠনিক ক্ষমতা।

দুর্গা পুজোর আগে হয়ে গেল "সুরন্ধন নাট্য উৎসব" কলকাতায় বেলেঘাটার সুকান্ত মঞ্চে । চারদিনে পাঁচটি নাটক পরিবেশন করে "অক্ষৌহিণী" নাট্য সংস্থা। সঞ্জীব নস্করের লেখা, পরিচালনা, অভিনয়ে "বঙ্গব্যঙ্গ"। নাটকটি জমে উঠেছিল। বর্তমান যুগের অবক্ষয়ের উপর লেখা নাটকটি নিয়ে সঞ্জীব নস্করের বক্তব্য, বর্তমান প্রজন্মের যুবকদের চেতনা ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে লেখা এই নাটক। তাঁর বিশ্বাস অবক্ষয় থেকে ফিরিয়ে সঠিক পথের দিশা দেখাতে সক্ষম হবে তার লিখিত নাটক "বঙ্গব্যঙ্গ"। ঘুম ভাঙবে বর্তমান প্রজাতির। তাঁরা ভবিষ্যতের আশায় করবে নিজেদের সংশোধন। সেজন্য তাঁর এই চাবুক। যে চাবুকের আঘাতে পাল্ট াবে এ সমাজ। যারা বিপথে চালিত করার চেষ্টা করছে, তারা সমূলে ধবংস হবে।

শুরুতে যে ধরনের সংলাপ দিয়ে আরম্ভ করেছি, এ ধরনের অনেক সংলাপে সমৃদ্ধ এই নাটকটি। নাট্যকারের বক্তব্য, বর্তমান হিন্দুদের অবস্থা তাঁকে ভাবিয়ে তোলে। ভাবিয়ে তোলে বর্তমান পরিস্থিতি। ভাবিয়ে তোলে হিংসার হানাহানি। ভাবিয়ে তোলে কিছু লোকের অপরিসীম লোভ। সেজন্য শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সংগঠিত হওয়া দরকার।

দরকার সঠিক পথ নির্ধারণের। দরকার সমাজে উপযুক্ত পরিচালকের, যার অভাবে তারা দিশাহারা। যারা বর্তমান যুবক, যারা জাতির ভবিষ্যত, নাট্যকার তাদের সচেতন করতে চান এই নাটকের মাধ্যমে। জাগ্রত করতে চান তাদের বিবেককে।

'বঙ্গ ব্যঙ্গ' নাটকের একটি দৃশ্য।

ক্ষমতার লোভে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে মানুষের বোধ বুদ্ধি কে বিপথে পরিচালনার বিরুদ্ধে এই নাটক। বর্তমান যুগে কার্য সিদ্ধি র জন্য এবং নিজ দম্ভ প্রকাশের জন্য অন্যায় করতে যারা দ্বিধা বোধ করে না, এমন কী ধর্ষণ এবং খুন করতে যাদের বিবেক কেঁপে ওঠে না তাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার ডাক এই নাটকে।

গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে রাখলে ভবিষ্যৎ পরিণতি কী তা দেখানো হয়েছে এই নাটকে।

নাট্যকার যুব সমাজকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। এ ধরনের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, এগিয়ে যেতে বলেছেন বলিষ্ঠ পদক্ষেপে।

দর্শকের অভিমত তাঁরা এ ধরনের নাটকের বহুল প্রচার চান। তাঁরা চান এ ধরনের সমাজ সচেতন নাটক পরিবেশিত হোক। জণগনকে উদ্বুদ্ধ করুক। তাঁরা অবিভূত অনেকদিন পর একটা ভালো নাটক দেখার জন্য।

নাটকে আশুর চরিত্রে অভিনয় করেন নাট্যকার স্বয়ং। হিরণ — এনায়েত ইসলাম, অনিরুদ্ধ — শেখর হীরা, অনামিকা — প্রিয়া চক্রবর্তী। এদের বলিষ্ঠ অভিনয় নাটককে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এছাড়াও শিবার চরিত্রে মানস মন্ডল, তপন — উজ্জ্বল ব্যানার্জী, অদ্বিতীয়া— অর্পণা মন্ডল প্রমুখের অভিনয় দর্শকের ভালো লাগবে। সব শেষে একটা কথা না বললে লেখা থাকবে অসম্পূর্ণ। সঞ্জীব নস্করের কোরিওগ্রাফি এ নাটকের একটি সম্পদ।

শব্দরূপ - ৪৮৫

আর্যরূপ পাল

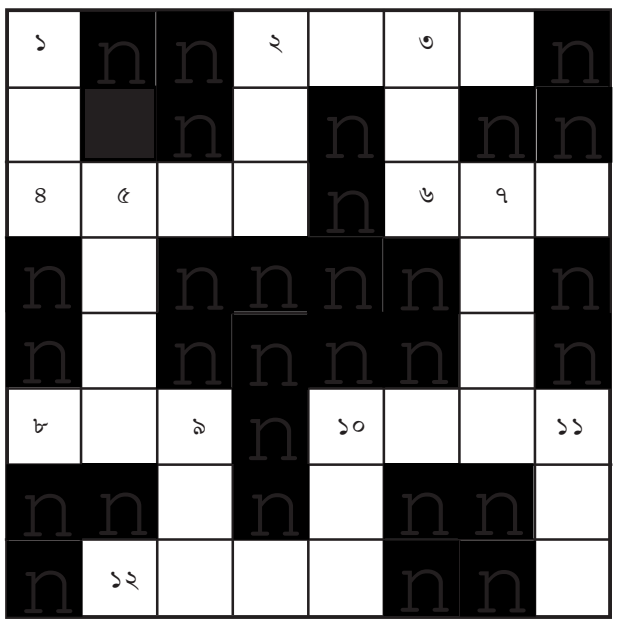

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. দিনলিপি, দৈনিক বিবরণের বই, মধ্যে কাব্যের জন, শেষ ঘরে জননী, ৪. জোড়বার উপকরণ, প্রথম দুয়ে কাষ্ঠ, ৬. অব্যয়ে যেহেতু, শেষ ঘরে বিপরীতে হ্যাঁ, ৮. আমেরিকার প্রাক্তন এক প্রেসিডেন্ট, শেষ ঘরে ইঙ্গ চতুর্থ অক্ষর, ১০. বিশেষণে স্ত্রী অর্থে নতুন, নব, ১২. গোলে হরিবোল, বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল।

উপর-নীচ ঃ ১. বকের সারি সমার্থে রবি ঠাকুরের কবিতা গুচ্ছ, ২. নগদ টাকা-কড়ির হিসাব, মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম অক্ষর, ৩. বিশেষণে নাটক রচয়িতা, কৃত্রিম অভিনেতাসুলভ হাবভাব পূর্ণ, ৫. বিশেষণে শূন্য, জলহীন, প্রতিশব্দে খটখটে করকরে, ৭. যে খাতায় নগদ খরচের হিসাব লেখা হয়, ইঙ্গ শব্দে কেস-বুক, তিনে কাটারি, ৯. ইঙ্গ শব্দে জ্বালানি তেলবিশেষ, শেষ দুয়ে কারাগার, ১০. বিশেষণে ব্রজবুলিশব্দে নবীন, শেষ দুয়ে গলাধরা কন্দ, ১১. ফর্দ, নির্ঘন্ট।

সমাধান শব্দরূপ ৪৮৩

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
ভরত কুন্ডু
কলকাতা-৬

গ	তি	বি	জ্ঞা	ন	■	সী
স্নু	■	■	ত	■	সি	ক	তা
জ	রা	■	ব্য	থা	■	■	প
■	হু	■	■	বা	চ	স্প	তি
স	ল	ম	ন	■	■	ন্দ	■
রো	■	■	হ	রা	■	ন	ব
ব	ধি	র	■	খা	■	■	য়ে
র	■	■	গ	ল	ক	স্ব	ল

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ২৪ নভেম্বর ২০০৮ সংখ্যায়।

মমতা ব্যানার্জী কি যোগেন মণ্ডল (স্ট্রীং) হতে চাইছেন ?

শিবাজী গুপ্ত

গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের বাংলার রাজনীতি সম্পর্কে যাদের সামান্য পড়াশোনা আছে, তারা তফশিলী নেতা যোগেন্দ্র মণ্ডলের ভূমিকার কথা অবশ্যই ভুলে যাননি। তার সামনে মন্ত্রীত্বের মুলো ঝুলিয়ে মুসলিম লীগ দল হিন্দু সমাজের সর্বনাশ সাধনে এবং দেশভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় যে মদত পেয়েছে, মাত্র দুই বছরের মধ্যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুর রক্তে তারা যোগেন্দ্র মণ্ডলের ঋণ পরিশোধ করেছে। সে রক্তের মধ্যে যোগেন্দ্র মণ্ডলের নিজ সম্প্রদায় নমঃশূদ্র নরনারী শিশুর রক্তও বড় কম ছিল না। মুসলমানদের মুরগী পীরিতের মতো যোগেন্দ্র পীরিত উবে যেতে বেশি দিন লাগল না। যোগেন্দ্র মণ্ডলের ঋণ তারা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করল দু'বছরের মধ্যে।

১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক হিন্দু বিরোধী দাঙ্গায় এতো বড়ো সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী নমঃশূদ্র জাতি ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। মুসলিম লীগ গুণ্ডার দল সরকারি সাহায্য ও প্রেরণাপুষ্ট হয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহর ও জেলার হিন্দুদের সমূলে ধ্বংস সাধন করল।

ঘটনাচক্রে ঐ ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখেই যোগেন্দ্র মণ্ডল করাচি থেকে ঢাকায় এসে উপস্থিত হন এবং স্বচক্ষে দাঙ্গার ভয়াবহতা ও হিন্দুদের ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেন। এদিকে তাঁর নিজের জেলা বরিশালের অবস্থা আরো ভয়াবহ। তিনি ঢাকায় বসেই সে খবর পান।

সুতরাং "তার পরের দিনই তিনি তাঁর জেলা বরিশালে চলে যান। সেখানে সব অবস্থা স্বচোখে দেখে ও জীবিত আত্মীয় স্বজনের কাছে পূর্ণ বিবরণ শুনে তাঁর এতকালের সযত্নে পোষিত মুসলিম লীগের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের মোহমুক্তি ঘটে।

তাঁর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও তাঁর সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে যার কাছেই খোঁজ খবর করেন তাঁর কাছ থেকেই শোনেন — 'নাই, নাই, নাই,' আর শোনেন, চারদিকেই বুকফাটা আর্তনাদ ও মর্মভেদী হাহাকার।

তিনি বরিশালে গিয়ে দেখেন, তাঁর সমাজের বস্তিগুলোর শ্মশানের দৃশ্য। বাড়ি নেই, নেই বলতে কিছুই নেই, আছে শুধু ছাই, আর ছাই!"

অথচ এই যোগেন মণ্ডলজী মুসলীম লীগের এমন পোষা পাখি ছিলেন যে, ১৯৪৬ সালে নোয়াখালির দাঙ্গায় চর অঞ্চলের নমঃশূদ্র গোষ্ঠী মুসলমান গুণ্ডাদের হাতে চরম লাঞ্ছিত হলেও তিনি এতে বিচলিত হননি, বরং সত্য গোপন করে বলেছিলেন নমঃশূদ্রদের উপর কোনই অত্যাচার হয়নি। তাঁর এই সঞ্জান পাপের শাস্তি তিনি পেলেন ৫০-এর দাঙ্গায় বরিশালের মুসলমানদের হাতে। পাপ কি বাপকে ছাড়ে? তাঁকে মন্ত্রীর গদি ছেড়ে পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

যোগেন মণ্ডলের এই নিদারুণ অভিজ্ঞতার পর বর্তমানে যারা মুসলমানদের নিয়ে রাজনীতিতে মেতেছেন, মুসলমান ভোটের জন্য মোল্লাদের তোল্লা দিচ্ছেন, রিজয়ানুর রহমানের জন্য চোখের আসু ফেলছেন, জামিয়ানগরের নিহত সন্ত্রাসীদের জন্য কেঁদে বুক ফাটাচ্ছেন। রোজা নমাজ পালন করছেন তাতেও কিন্তু ভবি ভুলবে না। মুসলমানদের চাহিদার শেষ নেই। তারা অল্পে তুষ্ট হবার পাত্র নয়। তাদের ষোল আনা দিতে হবে। সে ষোল আনা না পেলেই তারা কাকের রাজনীতিকদের দোজখে নিক্ষেপ করবে। সে দোজখের (নরকের) শাস্তি বড়ই নির্মম বড়ই কঠোর। সেকুলার সারমেয়ের দল সেদিকে যেন নজর রাখেন। খাস কোরানের পাতা থেকে তার নমুনা তুলে দিচ্ছি ঃ—

"অবিশ্বাসীদের (মূর্তিপূজক হিন্দুদের) জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি যাতে ওদের গায়ের চামড়া এবং উদরে ঘা আছে, তা গলে যাবে। ওদের জন্য সেখানে থাকবে লৌহ মুদগর। যখনই ওরা যন্ত্রণা কাতর হয়ে জাহান্নম হতে বেরুতে চাইবে তখনই তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে — ওদের বলা হবে আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা।"

সুতরাং সময় থাকতে সাধু সাবধান। মুসলিম ভোটের আশায় মমতা ব্যানার্জী যেভাবে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার কাছে আত্মসমর্পণ করছেন, তা কেউটে সাপের লেজ দিয়ে পিঠ চুলকাবার সামিল। বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না। অদূর ভবিষ্যতে তিনি দেখবেন তার আমও গেছে, ছালাও গেছে। মুসলমানরা ভোট দানের ব্যাপারে অত্যন্ত চোস্ত। কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল এবং মুসলমানদের নিজস্ব প্রার্থীরা — এদের কার বাক্সে মুসলমান ভোট ঢুকবে তা এখনো "আল্লা ন জানন্তি কুতো মমতাঃ।"

যে পরিমাণ মুসলিম ভোট বাক্সস্থ করার দুরন্ত আশায় তিনি কাছাইীন মোল্লাদের কাছা ধরেছেন, তার সে আশা কাছাকাছি নাও পৌঁছতে পারে। তার এই গায়ে পড়া মোল্লা পীরিতে হিন্দু মানসিকতায় যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে, তিনি সে খবর রাখেন কি? তিনি অমর সিং-এর মতো দুরাচারীর পাল্লায় পড়েছেন। তার কাছে দুর্বুদ্ধি তে আপনি খুঁকি। আপনাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। জামিয়ানগরে আপনি মুসলিম সন্ত্রাসীদের মৃত্যুতে কাঁদতে গেছেন, কিন্তু হিন্দু পুলিশ অফিসারের মৃত্যুতে আপনার হৃদয় কাঁদে না। সদ্য সঙ্ঘটিত দিল্লী বিস্ফোরণে নিহত হিন্দু নরনারী শিশুদের বাড়িতে যেতে তো আপনার সময় হয়নি। বেশি দিন নয়, আর মাত্র তো তিরিশ দিন। মুসলমানদের জন্য আপনার মতো শেখ-সেবিকাদের উপযুক্ত পুরস্কার দিতে দিল্লীর হিন্দুরাও কোমর বাঁধছে।

সিপিএম পশ্চিমবাংলার অর্ধাংশ মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের ক্রমাগত চাহিদা মেটাতে মেটাতে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেবেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। এবং মুসলমান সমাজের দুঃখ দারিদ্র্য যে কোনও মতেই দূর হবার নয় তিনি তা উপলব্ধি করতে পারেন। তারা কেন ডাকাত খুনী সন্ত্রাসী হয় তাও তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তে মুখ ফসকে সত্য কথাটি বলে ফেলেন যে — মাদ্রাসাগুলিই সন্ত্রাসবাদের বীজতলা। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হৈ হৈ। দাড়ি নেড়ে নেড়ে মোল্লা মৌলবী গোষ্ঠী রাইটার্সে ছুটল, আর সিপিএম দল প্রমাদ গুণল। ভোট হারাবার ভয়ে বুদ্ধ বাবু তোহবা করে তার কথা প্রত্যাহার করলেন এবং পার্টির নির্দেশে কয়েকশ নতুন মাদ্রাসা মঞ্জুর করে দিয়ে হাজার হাজার মোল্লার চাকুরীর ব্যবস্থা করলেন। ভাঙ্গা মসজিদ সারাবার টাকা, লুপ্ত কবরখানা পুনরুদ্ধারের টাকা, টাট্টি সারাবার টাকা, গা-গোসলের টাকা, মোল্লাপাড়ার পথ-ঘাট সাফসুরতের টাকা ইত্যাদি কত খাতে যে মোল্লাপাড়ায় টাকা ঢালা হচ্ছে তার আর হিসাবনিকাশ নেই। কিন্তু তাতেও তাদের ঘাটতি মিটছে না।

সুতরাং আসরে হাজির হচ্ছেন মমতা ব্যানার্জী। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাকী অংশ মোল্লাদের হাতে তুলে দিতে পারলেই তার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। কংগ্রেসী ও তৃণমূলী কংগ্রেসীদের আরাধ্য পুরুষ গুজরাটি গান্ধী মুসলমান নেতাদের ক্রমাগত ইতরতা ও বর্বরতায় তিতিবিরক্ত হয়ে দেশভাগের সঙ্গে বাংলা ভাগ করিয়ে পাকিস্তানের নাক কেটে দিয়েছিলেন। মমতা ব্যানার্জী পশ্চিমবঙ্গকে মুসলমানদের তুলে দিয়ে কি পাকিস্তানের ভাঙ্গা বা কাটা নাকা জোড়া দেবেন? হিন্দুরা তার কাছে সে জবাব চায়।

শিশুদের বস্ত্র বিতরণ করছেন সুশীল রায় ও জয়ন্ত সেন।

দেবদূত-এর পথ শিশুদেরকে নতুন জামা-কাপড় বিতরণ

সংবাদদাতা ।। পশ্চিমবঙ্গে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ণের জন্য যে সমস্ত স্বদেশপ্রেমী সমাজসেবী সংগঠন কাজ করছে 'দেবদূত' সংগঠন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সংগঠনটির মূল কার্যক্ষেত্র হুগলী জেলার গোঘাট অঞ্চলে হলেও কলকাতাতেও 'দেবদূত' বিভিন্ন ধরনের সমাজ তথা জনসেবামূলক কাজ করে চলেছে।

গত ৫ অক্টোবর, দুর্গাপুজোর মহাষষ্ঠীর দিন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'দেবদূত' এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলের ১০০ জন পথ শিশুদের হাতে নতুন জামা-প্যান্ট তুলে দেয়। বাংলা ও বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে দরিদ্র শিশুরা নতুন জামা-কাপড় পেয়ে যে আনন্দ পায় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি তথা সংবাদ সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'র সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর কার্যবাহ সুশীল কুমার রায়। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কামারহাটি সাগর দত্ত হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ সিদ্ধার্থ ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত সেন। সরকারি সাহায্য ছাড়া এই ধরনের কার্যক্রম করার মতো সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য 'দেবদূত' সংগঠনটি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আগামী দিনে আরও বড় ধরনের কার্যসূচী হাতে নেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন সংগঠনের সম্পাদক শ্রীসেন।

ভাঁওরলাল মল্লাবত সেবাকেন্দ্রের শাড়ি বিতরণ

দীপাবলি ও ছট পূজা উপলক্ষে গত ২৬ অক্টোবর ভাঁওরলাল মল্লাবত সেবা কেন্দ্র-এর উদ্যোগে জোড়াবাগানে দরিদ্র ও বস্তি এলাকায় বসবাসকারী মহিলাদের শাড়ি বিতরণ করা হয়। ভাঁওরলাল মল্লাবত সেবা কেন্দ্রের এই শাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী মীনা দেবী পুরোহিত। এছাড়া অনান্যদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী যুগল কিশোর জৈথলিয়া, সেবা কেন্দ্রের সচিব সত্যনারায়ণ খড়কিয়া, সহ সভাপতি রামগোপাল সুঙ্গা এবং ভাঁওরলাল মল্লাবতের পুত্র অরুণ প্রকাশ মল্লাবত ও পৌত্র অঙ্কিত, মনীষ আগরওয়াল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কালিয়াচকে রক্তদান শিবির

মালদা জেলার সেবা ভারতীর কালিয়াচক শাখার উদ্যোগে গত ৮ অক্টোবর এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ৩১ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। শিবিরে আলিপুর ও খাড়িয়ালিচক-এর বাসিন্দাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের কালিয়াচক মহকুমা প্রচারক মলয় দত্ত, মহকুমা সেবা প্রমুখ সৌমেন গুপ্ত ও স্থানীয় ক্লাবের সম্পাদক রতন গুপ্ত সহ অনান্যরাও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

মেদিনীপুরে বিজয়া সম্মেলন

গত ১৬ অক্টোবর মেদিনীপুর শহরের বক্সীবাজারে সরস্বতী শিশুমন্দিরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শুভ বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আইনজীবী বিমলেন্দু জানা। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ সঙ্ঘচালক লহর মুজমদার। প্রধান বক্তা সুহাস রঞ্জন পাত্র (কোষাধ্যক্ষ, জেলা সমিতি)। তিনি সমাজের সুরক্ষায় হিন্দু সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সংস্কার ভারতীর শিল্পী শ্রীমতি ছায়া খাঁড়া, সুকন্যা চক্রবর্তী সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

পরলোকে মুরারি মোহন দাস

গত ২৪ অক্টোবর ভোরে মুরারি মোহন দাস পরলোক গমন করেছেন। বেশ কিছুদিন তিনি রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বৎসর। ব্যক্তিগত জীবনে হুগলী জেলার ইটাচুনা কলেজে প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। কাটোয়া-তে সঙ্ঘের কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল। কন্যাকুমারিকাতে বিবেকানন্দ স্মারক মন্দির নির্মাণে কাটোয়া মহকুমায় তাঁর প্রয়াস ছিল মনে রাখার মতো।

পরলোকে বিমলা ঘোষ

গত ২৮ অক্টোবর বিকেল চারটায় হুগলী জেলার বীরপালা গ্রামে নিজ বাড়িতে পরলোক গমন করেন শ্রীমতি বিমলা ঘোষ। তিনি ছিলেন সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ-প্রান্ত প্রচারক গোবিন্দ ঘোষের মাতৃদেবী। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন ছয় পুত্র ও তিন কন্যা সহ নাতি-নাতনীদের। ছেলে ও নাতিরাও স্বয়ংসেবক। তাঁর বাড়িতে সদা সর্বদা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক, কার্যকর্তা ও প্রচারকদের জন্য ছিল অবারিত দ্বার। স্বয়ংসেবকদের প্রতি তাঁর পুত্রবৎ অকৃত্রিম স্নেহ ছিল সর্বদাই। বেশ কিছুদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত ও হৃদরোগে অসুস্থ ছিলেন।

সমাবেশ সমাচার

Swastika
10 November - 2008, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

প্রকৃতির মায়াময় ভুবন বরাক উপত্যকা

নিশুতি মজুমদার ।। ইতিহাসের প্রবহমান ধারায় যে কোনও স্থানেরই রাজনৈতিক মানচিত্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। প্রাচীন শ্রীহট্টের বৃহৎ অংশ এখন স্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্গত। বাকি অংশ ভারতের অসম রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তের বরাক উপত্যকার বর্তমান কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলা নিয়ে গঠিত। আগে এই তিনটি জেলা নিয়ে অখণ্ড কাছাড় জেলাকেই বোঝাত। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে অসম ছিল এক বিশিষ্ট প্রধান রাজ্য। এই রাজ্যের একটি জেলা ছিল কাছাড়। প্রাচীন গ্রন্থ ও পুরাণে এই উপত্যকাকে হিড়িম্ব রাজ্য বা হৈড়ম্বদেশ বলা হয়েছে। স্থানীয় ভাষায় কাছাড় শব্দের অর্থ পর্বতের পাদদেশের সমতলভূমি। অনেকেই মনে করেন, কাছাড়ি রাজার দেওয়া নাম থেকেই বরাক উপত্যকার নাম কাছাড় হয়েছিল। অবিভক্ত কাছাড় জেলার আয়তন ছিল ৬৯২২ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে বর্তমান কাছাড় ৩৭৮৬ বর্গ কিলোমিটার, করিমগঞ্জ ১৮০৯ বর্গ কিলোমিটার। ২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী তিনটি জেলার লোকসংখ্যা যথাক্রমে কাছাড় — ১৪,৪৪,৯২১; করিমগঞ্জ ১০,০৭,০৭৮; হাইলাকান্দি ৫,৪২,৯৭৮। সমগ্র বরাক উপত্যকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, ভাষাগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক পরিকাঠামো একই। ১৮৩২ সালে এই বরাক উপত্যকায় ইংরেজ শাসন কায়েম হবার পর দক্ষিণ অসমের শাসনতান্ত্রিক মূল কেন্দ্র হিসাবে শিলচর শহরের পত্তন হয়।

১৮৫৬ সালের চা-শিল্পের পত্তনই বরাক উপত্যকার সার্বিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। বর্তমানে বরাক উপত্যকায় মোট ২০৬টি চা-বাগান আছে। বরাক উপত্যকার উত্তরে বড়াইল পাহাড় ও খাসিয়া পাহাড়, দক্ষিণে লুসাই পাহাড়, পূর্বে মণিপুর রাজ্য এবং পশ্চিমে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ সীমান্ত।

বরাক নদীর উৎপত্তি স্থান নাগাল্যাণ্ডের আঙ্গামি পাহাড় থেকে সাগরের মোহনা পর্যন্ত মোট দৈর্ঘ ৯০০ কিলোমিটার। অসম রাজ্যে বরাকের দৈর্ঘ মোট ২২৫ কিলোমিটার। বরাকের শাখা নদীগুলির নাম জিরি, চিরি, মধুরা, ঘাঘরা, জাটিঙ্গা, কাটাখাল, সোনাই, ধলেশ্বরী, হারাং প্রভৃতি। বরাক নদী কাটিগড়ার কাছে সুরমা ও কুশিয়ারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে করিমগঞ্জের পাশ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই উপত্যকায় বড়াইল পাহাড়, ভুবন পাহাড়, সরসপুরের পাহাড়, ছাতাচুড়া পাহাড়ই প্রধান। এই উপত্যকায় বিভিন্ন জনজাতীয় লোক বসবাস করে, যেমন ডিমাসা, কুকি, নাগা, মার, খাসি, রিয়াং প্রভৃতি।

এই উপত্যকায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন মেডিকেল কলেজ, এন আই টি, পলিটেকনিক, বি টি কলেজ, ল' কলেজ এবং কেন্দ্রীয় অসম ইউনিভার্সিটি অবস্থিত। শিলচরে বেতার ও দূরদর্শন কেন্দ্র এবং সাংস্কৃতিক চর্চা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বরাক উপত্যকা বহির্জগতের সঙ্গে রেল সেবা, ন্যাশনাল হাইওয়ে ও বায়ুসেবার দ্বারা যুক্ত। তবুও সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বরাক উপত্যকা এখনও অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। শিলচর-বদরপুর-লামডিং ব্রডগেজ রেল পরিষেবা চালু হলে এবং ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার নর্গাও থেকে ডবকা হাফলং হয়ে শিলচর পর্যন্ত মহাসড়কের কাজ শেষ হলে মানুষ কিছুটা স্বস্তি বোধ করবে বলে ধারণা। বিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র, সুন্দর বনানী, চা-বাগানের ঘন সবুজ নৈসর্গিক দৃশ্যাবলি নিয়ে এই উপত্যকার পর্যটনের ক্ষেত্রেও সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। নির্বিকার সরকার ও উপযুক্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতাদের অভাবেই বরাক উপত্যকা পর্যটন বিকাশ আকর্ষণের ক্ষেত্রে অনেক পিছনে পড়ে আছে। এখানে বরাক উপত্যকার আকর্ষণীয় কিছু পর্যটন কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল।

(১) বদরপুর লামডিং রেলপথ — এই রেলপথে ভ্রমণকারী যে কোনও পর্যটকই বড়াইল পাহাড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হবেন সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই রেলপথেই সিলেট গিয়েছিলেন ১৯১৯ সালে। লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই রেলপথ ও প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্যের পটভূমি নিয়ে উপন্যাস ও কবিতা লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। অগণিত আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা, রেল সেতু ও নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী অপূর্ব বলা যায়।

(২) সাদারাশি মহাপ্রভু আখড়া — করিমগঞ্জ শহরের কাছে সাদারাশিতে চৈতন্যোত্তর পর্বের এক অতি উজ্জ্বল স্থাপত্যকীর্তির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এই স্থানে নিমকাঠের মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ বর্তমান।

(৩) বদরপুর দুর্গ — মোগল শাসনের অস্তমিত পর্বে যখন বাংলার মসনদে নবাব আলিবর্দি খাঁ অধিষ্ঠিত ছিলেন (আনুমানিক ১৭৩৪ সাল) তখন শিলহটের নবনিযুক্ত ফৌজদার সীমান্ত অঞ্চল বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে মোগল স্থাপত্য রীতিতে বদরপুরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন।

(৪) লাতু — করিমগঞ্জের পাথারকান্দির পশ্চিম প্রান্তে প্রতাপগড় হয়ে পাহাড়ি রাস্তা ধরে বিদ্রোহীরা চলাফেরা করত। লাতু একটি ঐতিহাসিক স্থান —১৮৫৭ সালে খবর নথিতে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছিল।

(৫) বদরপুর জাংলা কালী মন্দির — বদরপুর জংশনের টিলার ওপর জাংলা কালী মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরের দেবী খুবই জাগ্রত বলে জনসমাজে প্রচলিত।

(৬) বদরপুরঘাট সিদ্ধেশ্বর কপিলাশ্রম — শিলচর করিমগঞ্জ সড়কে হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলার সংযোগস্থলে বরাক নদীর তীরে অবস্থিত বদরপুরঘাট সিদ্ধেশ্বর কপিলাশ্রম। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এই স্থানটি অন্যতম প্রাচীন শৈবতীর্থ। কপিল মুনির কাহিনীর সঙ্গে এই আশ্রমের জনশ্রুতি আছে। বারুণি উৎসব উপলক্ষে বরাক নদীর উত্তর পারে পক্ষকাল ধরে এক বাৎসরিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

(৭) পাঁচগ্রাম — শিলচর-করিমগঞ্জ সড়কের পাশে হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত সুন্দর পাহাড়ি জায়গা পাঁচগ্রাম। সরসপুর পাহাড়ের এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছে হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশনের পেপার মিলকে কেন্দ্র করে এক টাউনশিপ। পাহাড়ের ওপর হেলিপ্যাড থেকে বরাক নদী, সবুজ উপত্যকা, বকরি হাওরের কিয়দংশের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর।

(৮) হাইলাকান্দি আদি কালী মন্দির — কাছাড়ি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের স্ত্রী ইন্দুপ্রভা দেবী হাইলাকান্দি শহরে ১৭০৭ সালে প্রাচীন কালী মন্দিরটি স্থাপন করেন। ঠিক সেই সময়ে হাইলাকান্দি থেকে ষোল কিলোমিটার দূরে লালা, চন্দ্রপুর গ্রামে কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের এক কালী মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। এখনও সেই মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ বর্তমান। যদিও সে স্থানে নতুন মন্দির নির্মিত হয়েছে। মন্দিরে মাটির ঢিপি ছাড়া কোনও বিগ্রহ নেই। লালা থেকে কাটলিছড়া যাওয়ার পথে জয়কৃষ্ণপুরে শকওয়ালা নামে একটি দিঘীও ছিল, বর্তমানে দিঘী প্রায় ভরে এসেছে। অনেকে আবার বিষ্ণুপুরে উদ্ধারপ্রাপ্ত মূর্তি ও জয়কৃষ্ণপুরের দিঘী ত্রিপুরী রাজাদের অবদান বলে মত প্রকাশ করেছেন।

(৯) কাটলিছড়ার বাদশাবাড়ি ও বনদুর্গা মন্দির — লালা থেকে বারো কিলোমিটার দূরে কাটলিছড়ার আলেকজেণ্ডারপুর বাগানে টিলার উপর শিব বা বাদশাবাড়ি ও বনদুর্গা মন্দির বরাক উপত্যকার উল্লেখযোগ্য দর্শণীয় স্থান। এই টিলায় অনেক প্রাচীন গাছ পিপল, তমাল, অর্জুন, কাঠালচম্পা, তুলাচম্পা বর্তমান। পাহাড়ের উপর থেকে চারপাশের অপরূপ দৃশ্যাবলি ও সূর্যাস্ত দেখা এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে এই মন্দির প্রাঙ্গনে বৃহৎ মেলা, কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

(১০) ভুবন পাহাড় — ভুবন পাহাড় কাছাড়া জেলার দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। শিলচর থেকে ভুবন পাহাড়ের দূরত্ব চল্লিশ কিলোমিটার। উপত্যকা থেকে তিন হাজার ফুট উপরে পাহাড়ের চূড়ায় পুরনো ভাস্কর্যের নিদর্শন, গুহামন্দির, সুড়ঙ্গ পথ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সুপ্রাচীন ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যে কোনও পর্যটককে আকর্ষণ করতে সক্ষম। শিবরাত্রি, দোল পূর্ণিমা ও বারুণী উপলক্ষে ভুবন পাহাড় থেকে সূর্যাস্ত দেখা এক বিরল অভিজ্ঞতা।

(১১) ফুলের তল — শিলচর-ইম্ফল জাতীয় সড়কের পথে ফুলের তল একটি গ্রাম। লক্ষীপুর বাজার থেকে দুই কিলোমিটার পূর্ব দিকে ফুলের তলের অবস্থান। এখানে বরাক নদীর তীরে পীর লঙ্গর শাহের মোকাম প্রসিদ্ধ। লক্ষীপুরে মণিপুরি মহিলা পরিচালিত বাজার আছে। সে বাজারকে ইমা কেইফেল বলা হয়।

(১২) বাঁশকান্দি — শিলচর শহর থেকে ষোল কিলোমিটার দূরে বাঁশকান্দি অবস্থিত। এখানে অসমের বিখ্যাত দরুল উলুম ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। বাঁশকান্দি আনুয়া প্রবাসী ও পরিযায়ী পাখির মুক্ত বিচরণ কেন্দ্র।

সরকার ও জনগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকলে এই বরাক উপত্যকা পর্যটনের ক্ষেত্রে আকর্ষক এক বিশিষ্ট স্থান হিসাবে পরিগণিত হবে– তার অন্যথা হবার নয়।

(সৌজন্যে দৈনিক সংবাদ)

বরাকভ্যালির অন্যতম শ্রদ্ধাকেন্দ্র সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com